আত্মজ্ঞান

আত্মজ্ঞান

স্বামী অভেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে জড়বাদ ও আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ জনসাধারণের মনোরাজ্যে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে, শিক্ষিত সমাজের অতিঅল্পসংখ্যক লোকই অমর আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুদিগের সনাতন ধর্ম ও বেদান্তদর্শনশাস্ত্রে আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য এই কথা বর্ণিত হইয়াছে। বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্‌সমূহে আত্মজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, উহা দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ও ধর্মের মূলভিত্তি-স্বরূপ। তজ্জন্য আত্মজ্ঞানানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবার প্রথম সোপানস্বরূপ আত্মানাত্ম-বিবেক এবং জড় ও চৈতন্যের পার্থক্য অনুভব করিতে চেষ্টা করা।

পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকার নিউ-ইয়র্ক-নগরীতে বেদান্ত-প্রচারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া আত্মজ্ঞান বিষয়ে প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে *Self-knowledge* নামে উক্ত বেদান্তকেন্দ্র হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ আমেরিকায় তথা সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এই বাংলা সংস্করণটি আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়া একটি ভূমিকার সন্নিবেশ করিয়াছেন। শ্রীআশুতোষ ঘোষ মহাশয়ও অনুবাদটি সযত্নে দেখিয়া দিয়াছেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে ঔপনিষদিক সত্যগুলি কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্যভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা তাঁহার গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

॥ ভূমিকা ॥

'আত্মজ্ঞান'-গ্রন্থটি ইংরাজী 'সেল্‌ফ-নলেজ'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ইংরাজী 'সেল্‌ফ-নলেজ'-গ্রন্থ কতকগুলি বক্তৃতার সমাবেশ। এই বক্তৃতাগুলি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকার তদানীন্তন বিদ্বদ্‌বর্গ ও বিভিন্ন শ্রোতাদের নিকট ইংরাজীতে বক্তৃতা দিয়াছিলেন নিয়মিতভাবে।

'আত্মজ্ঞান'-গ্রন্থ বিভিন্ন উপনিষদের বাণীকে অবলম্বন করিয়া রচিত। উপনিষৎ বেদের সারাংশ বা জ্ঞানবিচারের ভাগ। অর্থাৎ যে যে অংশে বেদের (চারিবেদের) মধ্যে নিহিত জ্ঞানের আলোচনা করা হইয়াছে তাহাদেরকে 'উপনিষৎ' বলে। উপনিষদের তত্ত্ব ও সত্যসমূহ ধ্যানপরায়ণ ঋষিরা নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাদিগকে উপলব্ধ সত্যরাশি বলা যায়। 'উপনিষৎ'-শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা এই তত্ত্বসমৃদ্ধ উপদেশবাণীর সংস্পর্শে আসেন, (নিকটে উপবেশন করেন) তাঁহাদিগের জীবন ও জ্ঞানের আলোকে আলোকিত হয় ও তাঁহারা অজ্ঞান-অন্ধকার ও জন্ম-মৃত্যুচক্র চিরদিনের জন্য অতিক্রম করেন।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বিশেষ করিয়া কৌষিতকী, বৃহদারণ্যক, কেন প্রভৃতি উপনিষদের তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন এই গ্রন্থে সহজ সরল ভাষায়। তিনি নিজে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় আত্মতত্ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থে উৎসর্গপত্রে উল্লিখিত : "By whose grace, the Bliss of Self-knowledge is realized" কথাগুলি হইতেই বুঝা যায়। তাহা ছাড়া তিনি যখন তাঁহার প্রিয়তম আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ-অনুযায়ী সাধন করিতেন তখন তাঁহার উপলব্ধিসমূহ শ্রবণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন : "এইবার তুমি অখণ্ডের ঘরে উপনীত হইয়াছ"। অখণ্ডের ঘর আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র। এই প্রসঙ্গে একথা বলাও সমীচীন হইবে যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বা

আত্মজ্ঞান নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই অতি সরল সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপনিষদের কঠিন তত্ত্বসমূহ সর্বসাধারণের সমাজে বিতরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

'আত্মজ্ঞান'-গ্রন্থের সূচনাতে, (প্রথম পরিচ্ছেদে) স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'চৈতন্য ও জড়বস্তু' লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন যুক্তি বিজ্ঞান ও বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, "যাহাদের আমরা প্রাণহীন জড়বস্তু বলি, তাহারা আসলে বা স্বরূপে চৈতন্যই। জড়বস্তু চৈতন্যের প্রকাশ ছাড়া অন্য-কিছু নয়, তবে জড়বস্তু চৈতন্যসত্তার অব্যক্ত অবস্থা, তাহার উপর অজ্ঞানের আবরণ সরিয়া গেলেই স্বরূপ-চৈতন্যের প্রকাশ হয়।"

কথা এই যে, আমাদের বহিরিন্দ্রিয় ও মন অজ্ঞানের পরিণাম, সুতরাং অন্ধকারে যেমন কোন জিনিসকেই দেখা যায় না, তেমনি অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত মন যথার্থভাবে চৈতন্যের আলোকে আলোকিত হয় না। তাই বিচারের প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিরও প্রয়োজন। তাই বুদ্ধির দ্বারা বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝি যে, জড়বস্তু যাহাদের বলি তাহাদের অণু-পরমাণুর মধ্যে সংহতি-রূপ শক্তি থাকে সেই শক্তি চৈতন্যেরই স্ফুরণ। সকল বস্তুতে শক্তি থাকে বলিয়াই জড়বস্তুর পরমাণুগুলি সংহত বা একত্রিত হইয়া জড়বস্তুর আকার সৃষ্টি করে, তাহার পর তাহাদের আমরা নামকরণ করি। কিন্তু জড়কণাগুলির মধ্যে সংহতিশক্তি চৈতন্যের সত্তা ছাড়া অন্য-কিছু নয়।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন, আত্মজ্ঞান লাভ করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। আত্মা—যিনি জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি ও সমস্ত-কিছু পরিবর্তন ও দ্বৈত বস্তুর সংস্পর্শ হইতে নির্মুক্ত সেই পূর্ণ ও অখণ্ড চৈতন্যসত্তার উপলব্ধির নামই 'আত্মজ্ঞান'। আত্মজ্ঞান উপলব্ধিরই স্বরূপ—'Self-knowledge is *realization.*' সাধারণ হস্ত-পদযুক্ত আমি মরণশীল মানুষ নই, কিন্তু অজর অমর ব্রহ্মস্বরূপ ; আমি সকল বন্ধন ও

সংশয়ের অতীত—একমাত্র সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা, এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানের নামই 'উপলব্ধি'। আত্ম-উপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে শারীরিক কোন অঙ্গের পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন হয় না, সংসার বা সৃষ্টি যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহারও নাশ, বিলুপ্তি বা বৈলক্ষণ্য হয় না, যেমন আছে তেমনই থাকে, কেবল পরিবর্তন হয় প্রত্যয়, জ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গীর। দৃষ্টিভঙ্গীর এইরূপ দিব্য-পরিবর্তন সাধিত হইলেই বুঝিতে হইবে 'আত্মজ্ঞান' অধিগত হইয়াছে এবং যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি বর্তমান শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও অশরীরির মতনই বিচরণ করেন। এই অশরীরি অবস্থা যাঁহার লাভ হইয়াছে তিনিই জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ বর্তমান রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া জীবিত থাকিলেও তিনি মুক্ত ও জ্ঞানী।

আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান 'সাধিত হওয়া,' 'লাভ করা' বা 'প্রাপ্তি হওয়া' এই সমস্ত কথা দার্শনিক যুক্তির নজিরে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, কারণ যাহা পূর্বে কখনও করা হয় নাই তাহাকে রূপায়িত করার নামই 'সাধন করা' বা তাহাকে নিজের আয়ত্তে আনার নামই 'লাভ' বা 'প্রাপ্তি' বলে। প্রকৃতপক্ষে আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান এমন কোন-কিছু নূতন বস্তু বলিয়া সৃষ্ট হয় না যাহার সম্বন্ধে আমরা ঐ 'সাধিত হওয়া,' 'লাভ করা' বা 'প্রাপ্তি' হওয়া শব্দগুলি ব্যবহার করিতে পারি। আত্মা আজও যেমন আছেন কালও ঠিক তেমনই থাকিবেন; অতীতে তিনি একই রূপে বর্তমান ছিলেন, আবার ভবিষ্যতে সমানভাবেই তিনি থাকিবেন, বিন্দুমাত্রও কোন পরিবর্তন বা বিকার তাঁহাতে ঘটিবে না। সুতরাং এই যে অবিকারী নিরবচ্ছিন্ন এক ও অদ্বিতীয় সত্তারূপ জ্ঞান বা প্রকাশ-স্বরূপ চৈতন্য ইনিই প্রকৃতপক্ষে 'আত্মা' বলিয়া পরিচিত। আত্মা চৈতন্যরূপে যেমন আমাদের শরীরেই আছেন, তেমনি সমস্ত জীব, জন্তু, বৃক্ষ-লতা, চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-উপগ্রহেও বর্তমান। আত্মা চৈতন্যসত্তায় আমাদের সকলের শরীরে নিয়ন্তারূপে আছেন বলিয়াই আমরা যাবতীয় কার্য সম্পাদন করি—যেমন আমরা বলি 'আমরা,

'আছি' 'আমরা করিতেছি' ইত্যাদি। এই যে আমাদের কার্য-সম্বন্ধে আমরা জানি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান থাকে—ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, আমিরূপ কর্তা ও ক্রিয়া এই উভয়কেই যিনি জানিতেছেন বা দেখিতেছেন তিনিই চৈতন্যময় আত্মা ; তিনি এই দুইটী হইতে পৃথক হইলেও আবার দুইটীতেই অনুস্যূত হইয়া আছেন।

তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মা চেতন বা চৈতন্যস্বরূপ হইলেও মানুষের মধ্যেই তাঁহার প্রকাশ ও সত্তা স্বীকার করিতে পারি, কিন্তু বৃক্ষ-লতা, গ্রহ-উপগ্রহ অথবা জড়বস্তুতে তাঁহার সত্তা স্বীকার করিব কেন? আমরা চেতনধর্মী তাহাকেই বলি যাহা কথা কহিতে পারে, সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে অথবা প্রশ্ন করিলে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। বৃক্ষ, লতা বা, সকল জড়পদার্থে ইহার কোনটীর লক্ষণ বা প্রকাশই তো দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং ইহাদিগকে প্রাণহীন অচেতনই বলিতে হইবে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বলিবেন—না, তাহা কেন? এই বিশ্বচরাচরে অচেতন বলিয়া কোন জিনিসই থাকিতে পারে না। বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে আমরা চেতন বলি, কেননা তাহারাও বাঁচিবার জন্য জীবনসংগ্রাম (struggle for existence) করিয়া থাকে, তাহাদেরও ক্ষয়, বৃদ্ধি আছে, তাহারাও সুখ দুঃখ অনুভব করে, সুতরাং আত্মচেতনা বা প্রাণের লক্ষণ হইতে তাহারাও বঞ্চিত নয়। স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র বসু গাছের যে প্রাণ আছে একথা প্রমাণ করিয়াছেন। উপনিষদে বা আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও বৃক্ষ-লতার প্রাণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। মোটকথা যে বস্তুরই ক্ষয় ও বৃদ্ধি আছে, যে বস্তু প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা ও শক্তি প্রদর্শন করে, সেই বস্তুই চেতন ও প্রাণবান। আমরা একটি প্রস্তরখণ্ড বা টেবিলকেও হয়তো অচেতন বলিয়াই অবজ্ঞা করিয়া থাকি, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখি যে, একটি প্রস্তরে বা টেবিলে আঘাত করিলে তাহা সেই আঘাত সহ্য করিয়া আবার প্রতিঘাত

আমাদের ফিরাইয়া দেয় (resist করে), তাহার পরমাণুগুলির ভিতরও যথেষ্ট একতা বা সম্বদ্ধতা আছে, কেননা আঘাত করিলেও তাহা কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা শিথিল হইয়া পড়ে না, একইভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার প্রাণের পরিচয় আমাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া তাহার পরমাণুগুলির সংহত অথবা একত্র হইয়া থাকিবার প্রচেষ্টা ও লক্ষণ হইতে প্রমাণ হয় যে, তাহাদেরও সংজ্ঞা আছে, তাহারাও চৈতন্যবান্ এবং জীবিত।

সকল বস্তুর ভিতর এই যে সংগ্রাম করিয়া সহ্য করিবার ও বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি ও আকুলতা ইহাই হইল প্রাণের লক্ষণ। এই প্রাণকেই উপনিষদে 'প্রজ্ঞা' বলা হইয়াছে। এই প্রজ্ঞাই বোধি বা জ্ঞান (higher intelligence or consciousness)। সমস্ত আপেক্ষিক জ্ঞানের অধিষ্ঠানই প্রজ্ঞা। আত্মা বা প্রজ্ঞা হইতে জ্ঞানের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু আত্মা বা প্রজ্ঞা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। আচার্যপাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'আত্মজ্ঞান' পুস্তকে এই তত্ত্বসমূহই সূক্ষ্ম বিচার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমস্ত জিনিসের মধ্যেই 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' আছে, এবং সকলেই আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। সংসারের বিচিত্র প্রবৃত্তি ও মোহরূপ অজ্ঞানের জন্যই আমাদের আত্মচেতনা আবৃত হইয়া আছে, আর সেজন্যই আমরা যে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব অপাপবিদ্ধ আত্মস্বরূপ এই জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা মোটেই সচেতন নই।

কিন্তু অজ্ঞান কি? আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে না জানার নামই 'অজ্ঞান'। এই অজ্ঞানের সম্বন্ধে আচার্য শঙ্কর বিচিত্র বিচার ব্রহ্মসূত্রের অধ্যাসভাষ্যে করিয়াছেন। অজ্ঞানকে তিনি বলিয়াছেন 'অধ্যাস'। একটি জিনিস যা—তাহাকে তাই বলিয়া দেখা বা জ্ঞান না করার নামই অধ্যাস। অধ্যাস ও অজ্ঞান একই। এই অজ্ঞান, অবিদ্যা মায়া, পরমেশ-শক্তি, প্রকৃতি অব্যাকৃতি অব্যক্ত ইত্যাদি নামেও কথিত। কেহ কেহ অজ্ঞানের ভেদ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন অবিদ্যা ও মায়া পরস্পর ভিন্ন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বরে যে অজ্ঞান থাকে তাহার নাম 'মায়া'

আর জীবাশ্রিত যে অজ্ঞান তাহার নাম 'অবিদ্যা'। তবে ঈশ্বর মায়াধীশ। বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি ভাষ্যকাররা অজ্ঞানের এই ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। বিবরণ-প্রস্থান ও আচার্য শঙ্কর নিজে অজ্ঞানের ভেদ স্বীকার করেন নাই। শঙ্কর বলিয়াছেন বিদ্যা ও অবিদ্যা অজ্ঞানেরই নামান্তর। মোটকথা আত্মবিস্মৃতির নামই অজ্ঞান বা অবিদ্যা। স্বার্থপরতাকেও অজ্ঞান বলে। যেদিন আমরা উপলব্ধি করিব যে, আমরা দেহ নই, মন নই, বুদ্ধি নই, ইন্দ্রিয় নই, কিন্তু দেহ মন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের স্বাক্ষীস্বরূপ আত্মা ও একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্ম সেইদিনই আমাদের দিব্য প্রত্যভিজ্ঞার উদয় হইবে, সেদিনই আমরা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইব।

কিন্তু মনের চিরচঞ্চল বিচিত্রমুখী গতি বা প্রবৃত্তিই আমাদের আত্ম-জ্ঞানলাভের পথে অন্তরায়। আমরা পার্থিব সুখরূপ আলেয়ার পিছনেই ক্রমাগত ছুটিয়া চলিয়াছি। পৃথিবীর সম্পদ, বিচিত্রভোগ ও সৌন্দর্যকেই কেবল উপভোগ করিয়া সুখী হইব, আত্মা বলিয়া কোন বস্তু আছে কিনা জানিবার আমাদের আবশ্যকতা নাই—এই যে মনোবৃত্তি ইহাই আমাদিগকে সর্বদা প্রবঞ্চিত করিতেছে। এই প্রবঞ্চনাই আসলে 'মায়া'। মায়ার অপর একটি নাম 'মন'। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁহার *Our Relation to the Absolute* গ্রন্থেও (পৃঃ ১৯৩ উল্লেখ করিয়াছেন—"*but mind is also a delusion.*" প্রকৃতপক্ষে [illegible] সংসার-বন্ধনের কারণ, কিন্তু এই বাসনার আধার ও কারণই আবার মন। মন আকাঙ্ক্ষা করে বলিয়াই বাসনার সৃষ্টি হইয়া থাকে; মন স্থির হইলে আর বাসনার সৃষ্টি হয় না। এজন্য যোগী ও শান্তিকামী সাধকগণ মনকে সংযত করিতে প্রথমে যত্ন করেন। এই যত্নকেই পাতঞ্জলদর্শনে 'অভ্যাস' বলা হইয়াছে,—'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ' (১।১৩)। মন যখন পৃথিবীর নশ্বর ভোগকেই ইহসর্বস্ব না ভাবিয়া আত্মচেতনাকেই কেবল ফিরাইয়া পাইতে চায় তখন সেই আন্তর-প্রবৃত্তি বা প্রচেষ্টার নাম ভোগের বিপরীত ভাবনা।

এইরূপ বিপরীত ভাবনার নামই আবার বিষয়বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য। মনকে তাই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনায় নিয়োজিত করিতে হয়। মন একবার আত্মানুসন্ধানে মগ্ন হইলে বাহিরের কোন তুচ্ছ বস্তুর প্রলোভন ও চাকচিক্য তাহাকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না। তখন আত্মোপলব্ধি বা আত্মাকে জানিবার জন্যই মন যথার্থভাবে আকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে। এই চেষ্টার নামই 'সাধনা'।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনন্তকাল ধরিয়া কামনার চরিতার্থ-রূপ ভোগে ডুবিয়া থাকিলে প্রকৃত শান্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে; সুতরাং শাশ্বতী শান্তির একমাত্র আকুলতাই আত্মজ্ঞান লাভের পথ প্রশস্ত করে মন শান্ত ও স্থির হইলে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন: 'ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, কিন্তু শুদ্ধমনের গোচর।' এই শুদ্ধমন ও মনোনাশরূপ শান্তি একই কথা। মন পরিশুদ্ধ হইলে আর মন থাকে না। মনের বৃত্তি লইয়াই তো মনের সার্থকতা? সুতরাং মন উপশান্ত হইলে আত্মচৈতন্যের দিব্যস্বরূপ সাধকের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। সাধকের জীবন তখনই ঠিক ঠিক ভাবে কৃতকৃতার্থতা লাভ করিয়া ধন্য হয়; আর এই কৃতকৃতার্থতা লাভের নামই 'আত্মজ্ঞান'।

"উপনিষদে আছে: "তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ; অমৃতস্যৈষ সেতুঃ;"—একমাত্র সেই আত্মাকেই উপলব্ধি কর এবং অন্য সব বৃথা অসার বাক্য পরিত্যাগ কর, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার ইহাই একমাত্র সেতু—এই বাণীর দ্বারাই বহু সহস্র বৎসর পূর্বে একদা প্রাচীন ভারতের দিব্যদ্রষ্টা আর্যঋষিগণ মহামুক্তির ও অমৃতত্ব-লাভের পথে সমগ্র মানবজাতিকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়াছিলেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' প্রভৃতি অমৃতবাণী!

প্রতিটি মানুষ অমৃতের সন্তান; সচ্চিদানন্দই তাহার প্রকৃত স্বরূপ অবিদ্যার আবরণে দেহাসক্তি ও ইন্দ্রিয়পরবশতার জন্যই সে নিজেকে পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহমাত্র মনে করে। কিন্তু সে যে

স্বরূপতঃ জন্মহীন মৃত্যুহীন শাশ্বত অব্যয় আত্মা—ইহা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারে না। এজন্যই রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ প্রপঞ্চময় বহির্জগতের প্রতি তাহার চিত্ত সর্বদা আকৃষ্ট ও অভিভূত হয়। আনন্দ ও অনন্ত সত্তা যে তাহাব মধ্যেই নিহিত, এবং সেগুলি তাহারই অভিন্নরূপ ও সত্তা—এই স্বরূপবিস্মৃতির জন্য বা ইহা জানে না বলিয়াই সে আপাতরম্য ক্ষণিক সুখপ্রদ ও মহাদুঃখদায়ক ঐন্দ্রিয়িক বিষয়কে ভোগ করিয়া সুখী ও আনন্দিত হইতে চায়। কিন্তু বারবার সংসারের বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতেব পর অবশেষে সে বুঝিতে পারে ইন্দ্রিয়-পরবশতায় বা বিষয় উপভোগে শান্তি নাই, আনন্দ নাই, আছে শুধু দুঃখ ক্লেশ ও যন্ত্রণা। তাই আর বিষয়ভোগের আপাতরম্য চাকচিক্যে সে ভুলিতে চায় না, কোথায় যথার্থ শান্তি—কোথায় মুক্তি এই আকুলতা, এই অধীরতা, এই অন্বেষণেই তাহাকে তাহাব স্বরূপকে জানিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু এই মহামুক্তি ও শাশ্বতী শান্তির সন্ধান সে এই সংসারে কোথায় ও কাহার কাছে আব পাইবে? যাহারা তাহারই মতন বিষয়ের নাগপাশে বদ্ধ, বাসনার বিষে জর্জরিত তাহারা কি করিয়া তাহাকে মহামুক্তির সুনিশ্চিত সন্ধান দিবে? এই মহামুক্তির—এই চিরশান্তির সম্যক্‌সন্ধান একমাত্র সেই লোকোত্তব দেবমানবের নিকটেই পাওয়া যায়—যিনি সংসারের সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং সাধনাব সর্বশেষ শিখরে উঠিয়া সমাধিসঞ্জাত প্রজ্ঞানেত্রে দেশ-কাল-নিমিত্তের পরপারে নিষ্প্রপঞ্চ পরম পরিপূর্ণ সত্যকে আত্মস্বরূপে সাক্ষাৎকারের দ্বারা পরমকল্যাণ ও আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র সেই আত্মক্রীড় আত্মরতি জ্ঞানমূর্তি লোকগুরুরই সান্নিধ্য, স্নেহ, করুণা, আশীর্বাদ, শিক্ষা ও সহায়তায়ই শ্রদ্ধাবান মুমুক্ষু মানব আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া মহামুক্তি ও চিরশান্তিলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের সুমহান আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সত্যতা আধুনিক যুগে জগতের সত্যান্বেষী মানবমাত্রের নিকট

অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ এই বিশ্বধর্মমূর্তি যুগগুরুর লীলাসহচর এবং তাঁহার অপরিমেয় আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের অন্যতম উত্তরাধিকারী। যথার্থ জীবন্মুক্ত মহাযোগীর সমাধিলব্ধ আত্মজ্ঞান তাঁহার স্বভাবসম্পদ ছিল বলিয়াই তিনি 'আত্মজ্ঞান' গ্রন্থে আপনার অনুভূতির দুরধিগম্য তত্ত্বকে এমন অপূর্ব-ভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি, সেজন্যই তিনি এই 'আত্মজ্ঞান'-গ্রন্থ পরমারাধ্য গুরুদেবকে উৎসর্গ করিতে গিয়া নির্ভীক ও অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়াছেন আপনার অপূর্ব অনুভূতির কথা—"To the Lotus feet of *Bhagvân Sri Râmakrishna*, my Divine Guru, by whose grace the Bliss of Self-knowledge *is realized.*"—'যাঁহার করুণাবলে আত্মজ্ঞানের অসীম আনন্দ অনুভব করিয়াছি আমার সেই দিব্যভাবময় গুরুদেব ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।'

সত্যই এই সুদুর্লভ আত্মজ্ঞানের—এই অমিত আধ্যাত্মিক অনুভূতির সমুন্নত শিখরে সগৌরবে সমাসীন ছিলেন বলিয়াই স্বামী অভেদানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী এত শক্তিপ্রদ, প্রাণপ্রদ ও অগ্নিগর্ভ। এই আত্মজ্ঞানের দিব্যসম্পদে সমৃদ্ধ ছিলেন বলিয়াই তিনি ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকায় বহু সত্যান্বেষী ধর্মপিপাসু নরনারীর ধর্মসম্বন্ধীয় নানা সমস্যার সমাধান করিয়া ভ্রান্তি ও সংশয়-নিরসনের দ্বারা পরমসত্যলাভের পথপ্রদর্শক ও বরেণ্য ধর্মগুরুরূপে তাহাদের চিরনমস্য।

প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দ আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধনপন্থার নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং তাহা কোন দেশগত, জাতিগত ও সম্প্রদায়গত গোঁড়ামী, অন্ধবিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। যুক্তি ও যথার্থ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারাই সত্যলাভের পথ আবিষ্কার করা যায়। ঋষিদের প্রদর্শিত আত্মতত্ত্ব লাভ করিবার জন্য যে বিচিত্র শিক্ষা ও পদ্ধতি তাহা অকাট্য যুক্তির—অচল অটল

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ঋষিদিগের সেই আধ্যাত্মিক ভাব ও সম্পদের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যজীবনের ও উপদেশের উদার-উদ্ভিন্ন আলোকে বেদান্তের এই সুমহান তত্ত্ব সমগ্র সভ্যসমাজের নিকট সগৌরবে ও মহাসাফল্যের সহিত প্রচার ও প্রমাণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বর্তমান গ্রন্থ তাঁহার সেই অপূর্ব মনীষা ও অমিত অধ্যাত্মসম্পদেরই অন্যতম নিদর্শন।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং
দশ প্রজ্ঞামাত্রা অধিভূতং।
যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যু
র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্যুর্ন ভূতমাত্রাঃ স্যুঃ ॥
ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিধ্যেৎ।"

কৌষীতকী-উপনিষৎ। ৩।৮

জ্ঞেয় অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সহিত বিষয়ীর (জ্ঞাতার বা আত্মার) সম্বন্ধ আছে এবং বিষয়ীরও (জ্ঞাতার বা আত্মারও) জ্ঞেয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে। জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে জ্ঞাতা বিষয়ী থাকিত না এবং জ্ঞাতা বিষয়ী (আত্মা) না থাকিলে জ্ঞেয় বিষয়ও থাকিত না। এই দুইটির মধ্যে একটি না থাকিলে কেবল অপরটির দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না।

প্রথম অধ্যায়

॥ জীব ও জগৎ ॥

জীব ও জগৎ-সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিচার সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞান, দর্শন-শাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্র করিয়াছে এবং এই সকল তাহাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়। বিভিন্ন দেশের মনীষীরা এ দুইটি শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং উহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ দুইটি নামের বিবিধ সংজ্ঞাও প্রচলিত আছে, যথা জীব ও জগৎ, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, পুরুষ ও প্রকৃতি, চেতন ও অচেতন ইত্যাদি। যুগে যুগে সকল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণও এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজ নিজ ভাব ও ধারণার অনুকূলে নানাবিধ যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা, মন বা পুরুষ হইতেই অনাত্মা, জড় বা অচেতন পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। জড়বাদীরা বলেন, জড়-পদার্থ হইতেই আত্মা, মন বা পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টিসম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ মতগুলি সংখ্যায় অধিক হইলেও সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে তাহাদের বিভক্ত করা যায়। যথা, অধ্যাত্মবাদ বা বিজ্ঞানবাদ, জড়বাদ এবং অদ্বৈতবাদ। অধ্যাত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদিগণ বলেন যে, আত্মা বা মন জড়জগতের ও অচেতন শক্তির স্রষ্টা।[১] সুতরাং আত্মাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বপ্রকার পদার্থেরও স্রষ্টা। ইহাদের মতে, অনাত্মা বা জড়পদার্থ আত্মা বা চৈতন্যের একটি অবস্থান্তর ছাড়া

১। "মনো হি জগতাং কর্তৃ মনো হি পুরুষঃ স্মৃতিঃ ॥"—যোগবাশিষ্ঠ।

আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে জড়বাদীরা বলেন, অচেতন, অনাত্মা বা জড় হইতে চৈতন্যের বা আত্মার বিকাশ হইয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সময়ে সময়ে বহু অধ্যাত্মবাদী বা বিজ্ঞান-বাদী দার্শনিক পণ্ডিতগণের আবির্ভাব হইয়াছে। ভারতবর্ষে, গ্রীসে, জার্মানীতে এবং ইংলণ্ডে বিশপ্ বার্কলের[২] ন্যায় বহু বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদিগণ এই প্রতীয়মান বাহ্য-জগতের এবং জড়ের সত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে, এই জড়জগৎ সমস্তই মনের সৃষ্টি বা বিকাশমাত্র। আমেরিকার আধুনিক বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, বিশ্বে জড়পদার্থ বলিয়া কোনও বস্তু নাই ; সমস্তই মনের কার্য। ইঁহারা বিশপ্ বার্কলে এবং তাঁহার সমশ্রেণী-ভুক্ত অন্যান্য বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকদের ধারণার অনুবর্তী হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমেরিকা মহাদেশে এই বিজ্ঞানবাদীদের সিদ্ধান্ত আবার সম্পূর্ণ নূতন ; কারণ আমেরিকাবাসিগণ জগতের অপর জাতি অপেক্ষা আধুনিক কালের জাতি। আমেরিকাতে এ পর্যন্ত কোনও প্রতিভাশালী বিজ্ঞানবাদী দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয় নাই।[৩] অপরপক্ষে আজকাল অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক, শরীর-তত্ত্ববিৎ, পদার্থবিজ্ঞানবিৎ, রসায়নশাস্ত্রবিৎ, চিকিৎসাব্যবসায়ী এবং ক্রমবিকাশবাদী এ বিশ্ব সম্বন্ধে জড়বাদের সমর্থন করেন। সমস্ত পদার্থের উপাদানকারণ জড়পদার্থ—ইহাই তাঁহারা

২। বিশপ্ বার্কলে ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানবাদী (Idealist) দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার মতে বাহ্যিক জগতে যাহা কিছু সবই মন বা দ্রষ্টারই সৃষ্টি—*essi is percepi.*

৩। বর্তমানে বহু বিজ্ঞানী ও দার্শনিক আত্মবিকাশ বিজ্ঞান ও দর্শন মতের পুষ্টিসাধন করিতেছেন।

প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা আরও বলেন, জড়পদার্থ হইতে মন ও আত্মার সৃষ্টি হইয়াছে। যদিও বিশ্বে অধিকাংশ লোকই এ সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন এবং জড়বাদী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তথাপি তাঁহাদের ভিতর বোধ হয় অতি অল্পসংখ্যক লোকই জড় অথবা অনাত্মার স্বরূপ কি, কিম্বা অনাত্মা বা জড় বলিতে কি বুঝায় তাহা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করিতে পারেন।

অনাত্মা বা জড়পদার্থটির স্বরূপ কি—তাহা কি কেহ কখন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? জড়বাদীদের জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আমরা কি জড় পদার্থ দেখিতে পাই? উত্তরে তাঁহারা বলিবেন—না, কারণ চক্ষুদ্বারা আমরা সাধারণতঃ যাহা দেখি তাহা বর্ণ ভিন্ন অন্য-কিছুই নহে। এই বর্ণ এবং জড়পদার্থ কি একই বস্তু? না, তাহাও নয়, কারণ বর্ণ একটি গুণবিশেষ। কিন্তু ঐ বর্ণ কোথায় থাকে? সাধারণ অজ্ঞ লোকের বিশ্বাস যে, পুষ্পের যে বর্ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাহা পুষ্পের মধ্যেই থাকে। শরীরতত্ত্ববিদগণ কিন্তু বলেন, আমরা যে বর্ণ দেখিতে পাই, তাহা পুষ্পে দেখা গেলেও সত্যকারভাবে পুষ্পে থাকে না। তাঁহাদের মতে, উহা (বর্ণ) একটি সংবেদন মাত্র; আমাদের চাক্ষুষ স্নায়ুবাহী চৈতন্যের সঙ্গে কোন বিশেষ এক-প্রকার স্পন্দনের সংস্পর্শ ঘটিলেই ঐ প্রকার সংবেদনের সঞ্চার হয়। ইহা সাধারণত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হইলেও তাহা সত্য। উহা বর্ণানুভূতির একটি যৌগিক ক্রিয়ার ফল। বায়বীয় পদার্থে (ether) প্রথমে কম্পন হয়, পরে ঐ কম্পন চক্ষু দিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং সেখানে কোষসমূহের মধ্যে আর এক প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করে। বর্ণ এই উভয় প্রকার কম্পনের ফল। মস্তিষ্ককোষের এই কম্পন চৈতন্যের আলোকে

আলোকিত হইলে অনুভব বা সংবেদন সৃষ্টি হয়। অতএব জড় ও চৈতন্যের সংমিশ্রণের ফলই বর্ণ। ইহা বাহ্য ও আন্তর এই উভয় ক্ষেত্রে প্রদত্ত বস্তুর সমাবেশের ফল। সুতরাং দেখা যায় যে, বর্ণ পুষ্পে থাকে না, উহা অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্তী ঝিল্লী, চাক্ষুস স্নায়ু ও মস্তিষ্ককোষের উপর নির্ভর করে; অতএব বর্ণ এবং জড়বস্তু এক হইতে পারে না।

আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, আমরা যে-সকল শব্দ শ্রবণ করি তাহাও কি জড়বস্তু? উত্তরে বলা যায়, না, প্রকৃত উহা জড়বস্তু নয়, উহা কোন এক বিশেষ প্রকার কম্পন ও মনের সচেতন-ক্রিয়াশীলতার ফল। নিদ্রিতাবস্থায় শব্দ-কম্পন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। সেখান হইতে শ্রবণকুশল স্নায়ুদ্বারা উহা মস্তিষ্ককোষে উপনীত হয়। কিন্তু তখনও আমরা শুনিতে পাই না, কেননা উপলব্ধিকরণক্ষম মন সেখানে না থাকায় কম্পন তখনও শব্দানুভবে পরিবর্তিত হইতে পারে না। অতএব শব্দ এবং জড়বস্তুও এক নহে। এরূপে দেখান যাইতে পারে আমরা যাহাকে 'জড়' বা জড়বস্তু বলি অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহার কোন পরিচয় ঘটে না। আর সে জন্য আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, জড়বস্তু ও 'জড়' বলিতে কি বুঝায়? জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল জড়ের সংজ্ঞা দিয়াছেন: "অনুভবের স্থায়ী সম্ভাবনাই জড় বা জগৎ।"[৪] অর্থাৎ স্থায়ীভাবে যে অনুভব থাকে তাহাকে জড়বস্তু বলে। মন-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, "স্থায়ী বোধশক্তিই মন।"[৫] এক্ষণে এই সংজ্ঞা দ্বারা আমরা বেশী কিছু বুঝিলাম কি? বরং বলিতে

৪। John Stuart Mill defines *matter* as the "permanent possibility of sensation."

৫। "Permanent possibility of feeling."

গেলে আরও গণ্ডগোলে পড়িলাম। যত-কিছু গণ্ডগোল ঐ সম্ভাবনা শব্দটিকে লইয়া। যাহা হউক উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে, যাহাতে অনুভব-কর্মটি স্থায়ীরূপে সম্ভব হয় তাহাই মন বা চৈতন্য। জড় নহে অথবা এরূপও বলা যাইতে পারে, যাহা স্থায়ীভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সংবেদনের বিষয় তাহাই 'জড়' বা জড়জগৎ এবং যে স্থায়ীভাবে তাহা অনুভব করে তাহাই 'জীব'। যাহাতে অনুভব-ব্যাপারটি স্থায়ীরূপে সম্ভব হয় তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, কেননা ইন্দ্রিয়গুলি অনুভবের দ্বার মাত্র, প্রকাশক নহে। জড়বস্তু শুধু অনুভবকার্যের সংঘটন করিয়া থাকে এবং উহাই জড়ের একমাত্র কার্য। যখন আমরা জড়জগৎকে পৃথকরূপে বুঝিতে চেষ্টা করি, কিংবা উহার বিশেষ কোন ব্যাপার অনুভব করিতে চাই তখন ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে কোন সাহায্য করে না। বর্ণানুভূতির পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয় যন্ত্রস্বরূপ মাত্র। শব্দানুভূতির পক্ষে সেরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় ও আঘ্রাণের পক্ষে নাসারন্ধ্র যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের যতটুকু ইন্দ্রিয়শক্তি, বাহ্যজগতের অনুভূতিও আমাদিগের নিকট ততটুকু হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষভাবে হউক আর পরোক্ষ-ভাবে হউক, যাবতীয় অনুভূতি আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াশীলতার ফল। আমরা জানি যে, দেশ ও কালকে অবলম্বন করিয়াই জড়বস্তু থাকে।[৬] আবার ইহাও জানি, জড়জগৎ নানাবিধ অনুভবের সংঘটন করে। কিন্তু তথাপি আমরা উহা দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে যাহাকে আমরা 'জড়বস্তু' বলি তাহা চিরকালই অতীন্দ্রিয় অবস্থায় থাকে। একখানি চেয়ার, একখণ্ড কাষ্ঠ

৬। আসলে জড়বস্তু দেশেও কালে থাকে। দেশ বিস্তৃতি ও কাল সময়।

অথবা স্বর্ণখণ্ড আমরা স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু স্বরূপতঃ জড়-বস্তুটিকে আমরা স্পর্শ করিতে পারি না। ইহা বড়ই বিচিত্র ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণ বা প্রস্তর কিন্তু জড়পদার্থ নহে, উহা জড় হইতে সৃষ্ট মাত্র। কাষ্ঠ বা প্রস্তরও জড়ের বিকার।

'জড়' শব্দের তথ্যটি একদিক হইতে চিত্তাকর্ষক। 'ম্যাটার' অর্থাৎ 'জড়'-শব্দটি লাটিন ভাষায় 'ম্যাটারিজ্' ('materies') শব্দ হইতে সৃষ্ট। 'ম্যাটারিজ্' অর্থে উপাদান। প্রথমে এই শব্দটি বৃক্ষের কাণ্ড বা গৃহাদি নির্মাণকার্যের উপযোগী কড়িকাঠ, বরগা ইত্যাদি বস্তুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইত। ক্রমে ইহার অর্থের বিস্তৃতি ঘটিল এবং উহাতে লোকে কোন কিছুর উপাদানভূত দ্রব্যকেই বুঝিতে লাগিল। যখন একটি কাষ্ঠ-নির্মিত মূর্তি গঠিত হইল তখন কাষ্ঠের উপাদান হইতে সেই মূর্তিটির একটু প্রভেদ করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তাহা হইলেও মূর্তিটি প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠ ব্যতীত অন্য-কিছু নহে। প্রস্তর বা ধাতুময়ী মূর্তির সম্বন্ধেও ঐরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উপাদান বলিতে সেই দ্রব্য বুঝিতে হইবে যাহা হইতে কোন-কিছু গঠিত বা আকারিত হইতে পারে। ক্রমে এইরূপ প্রশ্ন হইতে লাগিল যে, কোন্ দ্রব্যের দ্বারা এই পৃথিবী গঠিত হইয়াছে? উত্তর হইবে, ম্যাটারিজ্ বা জড়ের দ্বারা। অতএব এই 'জড়'-শব্দটিতে কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুকে বুঝায় না। তবে যে অজ্ঞাত বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলির সৃষ্টি হইয়াছে, জড় বলিতে আমরা তাহাই বুঝিয়া থাকি এবং ইহাই ঐ শব্দের মূল ও প্রকৃত অর্থ। কোন বস্তু বা আকারবিশিষ্ট পদার্থের মূলে যে অজ্ঞাত অব্যক্ত উপাদান থাকে, জড় অর্থে তাহাই বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, কথোপকথনের সময়ে আমরা ইংরাজীতে সচরাচর বলিয়া থাকি "হোয়াট্ ইজ্ দি

ম্যাটার ?” “ইট্ ডাজ্ নট্ ম্যাটার,” “ইম্‌পর্‌ট্যান্ট্ ম্যাটার,” “ডিকেয়িং ম্যাটার” ইত্যাদি। কথাগুলির প্রত্যেকটিতেই অনির্দ্দিষ্ট কোন বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী ভাষায় ‘ম্যাটার’ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ‘ম্যাটার’ বা ‘জড়বস্তু’ অর্থে কোন অজ্ঞাত বস্তুই বুঝিতে হইবে, যাহা বাহ্যজগতে তখন প্রকাশিত হয় না।

বিজ্ঞান ও দর্শনের মতে, যে অজ্ঞাত উপাদান হইতে যাবতীয় ব্যবহার্য দ্রব্যের উদ্ভব হইয়াছে, জড় বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে। ইহা অতীন্দ্রিয় বস্তু হইলেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থে ইহা অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ইহা নিজে দেশ কাল নহে, অথচ ইহা দেশকে ব্যাপিয়া আছে। কালেও ইহা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কারণসূত্রে শৃঙ্খলিত নহে। যাহা হউক এতগুলি ভাব ঐ জড় শব্দটির অর্থে নিহিত। যে উপাদান হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপায়িত, যখন আমরা তাহার চিন্তা করি, তখন আমাদের মনে হয় উহা বিরাট মহান অপরূপ ও অদ্ভুত শক্তিশালী। সেই শক্তিই সর্বদা নানাভাবে প্রকাশিত হইতেছে! কিন্তু তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা করি—জড়পদার্থটি কি ? সেটি এক, না বহু ? উত্তরে বলিতে হয়—উহা একই, উহা কখনও বহু বা বিচিত্র হয় না। হর্বার্ট স্পেন্‌সার্ বলেছেন ঃ “শুদ্ধজড়ের ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে একটি তুলনা দ্বারা উহা করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে, জড়বস্তু ও দেশ একই সময়ে অবস্থিত দুইটি কার্য বা ঘটনা। জড় বাধা প্রদান করে, দেশ কোন বাধা প্রদান করে না।”[৭]

৭। *Vide Fitit Principles*, p. 140.

অর্থাৎ জড়বস্তুমাত্রে আমাদের হস্ত প্রতিহত হয় এবং তাহা হইতে আমরা বাধা পাই।

এক্ষণে দেশ ও জড়ের পার্থক্য কি ? তাহা দেখা যাক। দেশ একটি বিস্তার, ইহা কোন প্রকার বাধা প্রদান করে না। কিন্তু যাহা বাধা দেয় ও দেশের ভিতর অবস্থান করে তাহাই জড়বস্তু। হর্বার্ট স্পেন্‌সার্ আরও বলিয়াছেন : "জড়বস্তু ও দেশ এই দুইটি বিশ্লেষণের অতীত মূল-তত্ত্বের মধ্যে প্রতিরোধ বা বাধা দেওয়ার কার্যই জড়ের মুখ্যগুণ আর ব্যাপকত্ব গৌণগুণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যখন আমরা কোনও বস্তু স্পর্শ করি তখন উহা আমাদের বাধা দেয় এবং হস্তের গতির প্রতিরোধক এমন কিছু আছে ইহা আমাদের উপলব্ধি হয়। কিন্তু যখন আমরা সেইবস্তু স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রসাবণ করি তখন এই বাধা বা প্রতিরোধের ভাব দেশের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়।" তিনি পুনবায় বলিয়াছেন : "যাহা হইতে জডেব অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হয় তাহা এক প্রকার শক্তির কার্য বলিয়া আমাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে অর্থাৎ যাহা আমাদের মাংসপেশী সঞ্চালনের সময় তাহাতে অবস্থিত সুপ্তশক্তির প্রতিরোধক শক্তির কথা স্বতঃই মনে জাগ্রত হয়। যে সুপ্তশক্তি ঐরূপ প্রতিরোধ কবে তাহাকেই প্রকাশিত বা শক্তি (force) বলা হয়। সুতরাং তাহাকে আমরা 'ম্যাটার', জড় বা অনাত্মা বলি, যাহা কেবল ব্যক্তশক্তি যাহা দেশেব সহিত একপ্রকার ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধে সম্পর্কিত মাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন : "ম্যাটার ও তাহার গতি ঐ শক্তিগুলিরই বিভিন্নপ্রকার অভিব্যক্তিমাত্র।[৮] জড় ও অনাত্মারূপ স্থূল পদার্থগুলি বাহ্যিক শক্তিসমষ্টি ও আমাদের মানসিক উপলব্ধিসমূহ একত্রে সংমিশ্রিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে।" প্রতিরোধ বা বাধা অনুভব করিবার

৮। মোটকথা ম্যাটার ও ফোর্স জড় ও শক্তি একই অজ্ঞাত বস্তুর দুটি প্রকাশ মাত্র।

জন্য একজন সচেতন অনুভবকারী কর্তা থাকা আবশ্যক। এই অনুভবকারী জ্ঞাতা বিদ্যমান থাকিলেই প্রতিরোধকারী শক্তিটি অনুভব করিতে পারা যায় এবং সেই শক্তি হইতেই জড় বা অনাত্মা সম্বন্ধীয় ধারণা আমাদের উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সৃষ্টি হইবে, অথবা জড়বস্তু ধ্বংস হইয়া যাইবে, তাহার কিছুই থাকিবে না, এরূপ কল্পনাও কেহ কখন করিতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, জড়জগৎ উৎপত্তি ও বিনাশশীল নহে। ইহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই এবং কখনও ইহার ধ্বংস হইবে না। জড়ের আরও অনেক প্রকার সংজ্ঞা আছে। কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ (Physicist) বলেনঃ "যাহার কেন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করিবার শক্তি আছে তাহাকেই জড় বলে।" কিন্তু ইহাতেও আমরা জড়ের যথার্থ প্রকৃতি জানিতে পারি না। ইহাতে এইটুকু মাত্র বলা বা জানা যায়, এমন একটি পদার্থ আছে যাহা আকর্ষণে সাড়া দিয়া থাকে। আর্ণষ্ট্ হেকেল্ বলেনঃ "অসীম বিস্তৃত পদার্থই জড়জগৎ, আর সর্বগ্রাহিণী চিন্তাশক্তিই জীব।"

এরূপ বহুপ্রকার সংজ্ঞা আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই, যে মূল-উপাদানে এই বিশ্ব গঠিত তাহাই 'জড়'। অথবা যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও মনের গোচর তাহাই জড়। এই জড় নিত্য জ্ঞেয়স্বরূপ এবং জীব বা মন সর্বদাই চৈতন্যস্বরূপ যিনি জড়জগতের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিদ্যমান। সুতরাং এখন এরূপে উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি যে, জীব দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা আর যাহা উপলব্ধি করিতে হয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে হয়, জানিতে হয়, তাহাই জড়। একটি বিষয়ী, আর অপরটি বিষয়। এই দুইটি পরস্পর সর্বদাই সংবদ্ধ থাকে। বাহ্যজগৎ এক অর্ধাংশ, অপর অর্ধাংশ আধ্যাত্ম জগৎ অথবা জীব।

অতএব জড়বাদীদের অভিমত একদেশদর্শী ও অসম্পূর্ণ, কেননা উহারা বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু বিষয়ীর অর্থাৎ জীবের (বা মনের) সত্তা অস্বীকার করেন। বিষয়ীকে আশ্রয় করিয়া বিষয় থাকে, অন্যথা পারে না—এ কথাটি জড়বাদীরা অস্বীকার করেন। তাই জড়বাদীদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই উভয় বস্তু যে স্বরূপত কি—সেই সম্বন্ধে না জানার বা সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতাই জড়বাদের ভিত্তি। জড়বাদ অনুসারে জড় জগৎ বা অনাত্মা জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হয়েছে যে, এই জ্ঞেয় বিষয় হইতেই জ্ঞাতা বিষয়ীর সৃষ্টি। কিন্তু এ সিদ্ধান্তও ঠিক নয়। কারণ 'ক' কখনও 'ক'-এর অভাব হইতে পাবে না। জড় বা অনাত্মা জ্ঞেয়-পদার্থ বা জ্ঞানের বিষয় (objective)—এই ধারণা হইতে জড়বাদের সৃষ্টি। কিন্তু জড়বাদ পরিশেষে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে যে, এই জ্ঞেয় জড় জগৎ বা অনাত্মা বিষয় হইতেই বিষয়ী বা জ্ঞাতাস্বরূপ আত্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই মতে, প্রথমেই স্বীকাব করিয়া লওয়া হয় যে, যাহাকে উপলব্ধি করিতে হয়, অথবা যাহা অনুভবের বিষয়, তাহাকেই জড় বা জড়বস্তু বলে। ক্রমে এই কথাও স্বীকৃত হইয়াছে, এই জড় হইতে এমন কিছুর সৃষ্টি হয়—যাহা জ্ঞাতা। কিন্তু এই কথা স্ববিরোধী ও অসঙ্গত। জড়বাদ যেমন একদেশী ও অসম্পূর্ণ, ভাববাদ অথবা বিজ্ঞানবাদও সেইরূপ। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মতে, জড় বা বিষয়ের সত্তা অস্বীকৃত। ইহার মতে সবই মন বা বিজ্ঞান। বর্তমান খৃষ্টান সায়েন্সের মতে সবই মন, জড় বা জগৎ বলিয়া কোন-কিছু নাই। এই মতটিও জড়বাদের ন্যায় ভ্রমপূর্ণ। জীব, মন বা অহং (ego) চিরকালই

বিষয়ী, ইহা অনুভবের কর্তা বা জ্ঞাতা। অনুভবকার্যের, অথবা জ্ঞানের বিষয় যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই উহার কর্তাও থাকিতে পারে। একটির সত্তা স্বীকার করিলে অপরটির সত্তাও অনুমিত হয়। এজন্য মনীষী গ্যেটে (Geothe) যথার্থই বলিয়াছেন ঃ "জীব ব্যতীত জড় থাকিতে বা কার্য করিতে পারে না; আবার জড় না থাকিলে জীবের সত্তা এবং কার্যকারিতাও সম্ভব হইত না।"

সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বিষয়ী ও বিষয় এ দুইটি একই ব্যাপক সত্তার (ব্রহ্মের) দুইটি অবস্থা। উহারা যেন ঐ সত্তার দুইটি বিভাগ। ঐ সত্তা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। স্পিনোজা উহাকেই 'সাব্‌ষ্ট্যান্‌শিয়া' বা মূলতত্ত্ব বলিয়াছেন। হার্বার্ট স্পেন্‌সার উহাকে "অজ্ঞেয়" আখ্যা দিয়াছেন। উহাই ক্যাণ্টের অজ্ঞাত ও বিশ্বোত্তীর্ণ সত্তা (Thing-in-itself)।[৯]

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ইহাকেই 'সর্বোত্তম ঈশ্বর' (Good) আখ্যা দিয়াছেন, আমেরিকান দার্শনিক এমার্সন ইহাকেই "পরমাত্মা" (Over-soul) বলিয়াছেন এবং বেদান্তের মতে ইনিই "ব্রহ্ম" বা ব্যাপকচৈতন্য। ইনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সনাতন সত্য—যাহা হইতে স্থূল, সূক্ষ্ম ; অনাত্মা, আত্মা—সকলকিছুরই সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', অর্থাৎ এক ও অদ্বিতীয়, বহু নহে। বিশ্বচরাচর সৃষ্টির প্রারম্ভে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এই এক ব্রহ্মসত্তা হইতেই উদ্ভূত হয় এবং প্রলয়কালে তাহারা সকলে সেই ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। বেদান্তে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্রে একথা বলা হইয়াছে। এই অনন্ত আধারস্বরূপ ব্রহ্মে মায়া বা প্রকৃতি ছিল এবং সেই প্রকৃতি

৯। কিন্তু বেদান্তের মতে, মূলতত্ত্বরূপ আত্মা একেবারে অজ্ঞাত নন, বরং জ্ঞানের বিষয়।

হইতেই প্রকাশমান যাবতীয় বস্তু ও শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকৃতিকেই আদ্যাশক্তি, মহামায়া, জগন্মাতা ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিতেছি যে, বিশ্বের দৃশ্যমান যাবতীয় শক্তি একটি অন্যের সহিত আপেক্ষিকভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহারা সেই নিত্য ব্রহ্ম ও তাঁহার নিত্যা প্রকৃতিরই অভিব্যক্তি মাত্র।

উপনিষৎ বলে,

এতস্মাজ্জয়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥[১০]

'এই মূলসত্তা হইতে প্রাণ, সর্ব্বপ্রকার মানস ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসকল এবং ভৌতিক শক্তিসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে ও নানাভাবে ও নানা আকারে পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।' ইহাই একত্ববাদ বা অদ্বৈততত্ত্ব। বর্তমানে জার্মাণ বৈজ্ঞানিক আর্নেষ্ট হেকেল-প্রমুখ একত্ববাদীগণ স্বীকার করেন যে, ঐ নিত্য বস্তুই জড়, চেতন এবং সর্বপ্রকার শক্তিসমূহের উদ্ভবের হেতু। তাঁহারা বেদান্তের মহান্ সত্য 'এতস্মাজ্জয়তে' ইত্যাদি বাক্যও স্বীকার করিয়াছেন। সেই এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে একদিকে জীবনীশক্তি অর্থাৎ প্রাণ, মন, মানসিক ক্রিয়াসমূহ এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তি সমন্বিত জীব সৃষ্টি হইয়াছে, আর অপর দিকে জড়রাজ্যের অন্তর্গত দেশ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি আপঃ (তরল) ও পৃথিবী অর্থাৎ কঠিন (solid) প্রভৃতি স্থূল পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। এক কথায় সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতেই একদিকে জীবাত্মার ও অপরদিকে অনাত্মা বা জড় জগতের বিকাশ হইয়াছে। বেদান্তে এটিই অদ্বৈততত্ত্ব। পাশ্চাত্যের আধুনিক

১০। মুণ্ডকোপনিষৎ ২।১।৩

বিজ্ঞানবাদী মনীষীরা বলেন, 'ম্যাটার' অথবা জড়জগৎকে অতি-সূক্ষ্মাবস্থায় বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহা সর্বাধার বা আধারভূত সেই অসীম ব্রহ্মসত্তাতেই পরিণত হইয়া থাকে। সেজন্য বেদান্তের মতে অসীম অনন্ত ব্রহ্মসত্তাই নিখিল বিশ্বের অনাত্মা এবং আত্মা, অচেতন ও চেতন এই দুই ভাবের মূলেই বিদ্যমান। সেই ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। যদিও ইহা এক ও অদ্বিতীয় তথাপি ইহা অনির্বচনীয় মায়াশক্তির প্রভাবে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আর ইহাই বেদান্তের 'মায়া'।

এই জগৎ কেবলই অচেতন পদার্থে সৃষ্ট নহে, অথবা উহা পরমাণুসমষ্টির সমবায়ের পরিণতিও নহে। এতদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যদেশীয় পদার্থবিজ্ঞানবিদ্, রাসায়নিক এবং অপরাপর জড়বাদীরা বিশ্বাস করিতেন যে, পরমাণুগুলির প্রত্যেকটি অবিভাজ্য পদার্থ এবং উহারা অনন্ত অসীম আকাশে ভাসিতেছে। উহারা পরস্পরের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি দুটির অধীন হইয়া ঘুরিতেছে; উহারা স্বতঃই যাবতীয় নৈসর্গিক বস্তু উৎপাদন করিতেছে এবং উহাদিগের দ্বারাই এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সুবিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জে. জে. টমসন বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রয়োগ-পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, তথাকথিত অবিভাজ্য পরমাণুকেও সূক্ষ্মতর অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই-রূপ সূক্ষ্মতর অংশকেই 'ইলেক্ট্রন ও প্রোটন'—বিদ্যুতিন্ অথবা বিদ্যুন্মাত্রা বলে; এবং ইহা প্রাচীন হিন্দু-বৈজ্ঞানিকদিগের তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র ভিন্ন অপর কিছুই নহে। যদি পরমাণুগুলি 'ইলেক্ট্রন'-এরই সমষ্টি হয় এবং যদি 'ইলেক্ট্রন'-গুলিই তন্মাত্রা অথবা শক্তিকেন্দ্র হয় তাহা হইলে উহারা

কোথায় থাকে? এই প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত বলে, তাহারা অনাদি ও অব্যক্ত সর্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতির আধার সেই ব্রহ্মস্বরূপ অনাদি অনন্ত কারণসমুদ্রের মধ্যেই অবস্থিত রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, 'ম্যাটার', জড় বা জগৎ এবং শক্তি বা মায়া সেই এক অদ্বিতীয় মহাকারণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত কিরূপ অভিন্ন সম্বন্ধবিশিষ্ঠ। ইহার এক অংশ ম্যাটার বা জড়জগৎ, জ্ঞেয় বা বিষয় এবং অপর অংশ স্পিরিট, জ্ঞাতা ও বিষয়ী আত্মা। ইতিপূর্বে বলিয়াছি বর্তমান বিজ্ঞানের আলোকে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জড়ের সৃষ্টি নাই ও বিনাশ নাই। শক্তিও সেই প্রকার সৃষ্টি ও ধ্বংসহীন। জড় ও শক্তিকে নানাবিধ আকারে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই ধ্বংস করা যায় না। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি জগতের এক অর্ধাংশ জড় বা জাগতিক শক্তি সৃষ্টি ও বিনাশবিহীন হয় তবে জীবের আকৃতি কিরূপ হইবে? উহাও কি সৃষ্টি ও বিনাশশীল হইবে? যদি বিশ্বের বহির্বিকাশের সৃষ্টি ও বিনাশ না থাকে, তবে আবার অর্ধাংশ মন বা জীবই কেমন করিয়া জীবন ও মরণের অধীন হইতে পারে? না, উহা অসম্ভব। স্বরূপতঃ জীব ও জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ নাই। জড়জগৎ বা বিষয় যদি অনাদি, শাশ্বত ও অবিনাশী হয়, তবে জীব অথবা বিষয়ীও অনাদি এবং অবিনশ্বর হইবে। জীব নিত্য ও অবিনশ্বর না হইলে জড়ের নিত্যত্ব অসম্ভব হইয়া পড়ে। জীব বা বিষয়ী নিত্য না হইলে জড়শক্তি যে অবিনশ্বর তাহার সন্ধান অথবা পরিচয়ই বা কে লইবে? বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ বিখ্যাত মনীষী ও বৈজ্ঞানিকই এই বিচার্য বিষয় যেন উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন জড়জগৎ ও তাহার শক্তির চিরস্থায়ীত্ব ভাবিতে গেলেই জীব বা মনের

নিত্যত্ব কথাই আগে মনে আসিয়া পড়ে। একটির নিত্যতা অসিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটির নিত্যতাও নষ্ট হইয়া যাইবে। তাই জীব ও জড়ের চরম-বিশ্লেষণ করিয়া জানা গিয়াছে যে, উভয়ই সৃষ্টি ও বিনাশবিহীন এবং উভয়ই শাশ্বত ও সনাতন। যদি আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তিযুক্ত একটি চুম্বকের এক প্রান্ত অপরিবর্তনশীল হয়, তবে অপর প্রান্তেরও ঐরূপ হওয়া আবশ্যক। আবার উহার যে স্থলে উভয় শক্তি মিলিত হইয়াছে সেই মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ কেন্দ্রটির (neutral point) অপরিবর্তনশীলতা স্বীকার করিতে হইবে। এই বিশ্ব যেন একটি প্রকাণ্ড চুম্বক-পাথরের মতো। উহার একটি দিক জড়জগৎ বা বিশ্ব ও অপর দিক জীব; ব্রহ্ম যেন ইহাদের উভয়ের মিলনস্থল। সুতরাং বলিতে গেলে এই তিনটীই অর্থাৎ জড়জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম অপরিবর্তনশীল।

বেদান্তে চৈতন্যময় বিষয়ী, দ্রষ্টা ও জ্ঞাতার স্বরূপকে 'আত্মা' বলে। এই আত্মাই সকলের যথার্থ স্বরূপ। আত্মা অনাদিকাল হইতে আছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্তকাল পর্যন্তও থাকিবেন, কেহই ইঁহার বিনাশ সাধন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আকারসমূহ পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু শাশ্বত আত্মার কোনদিন কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটিবে না। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। সেই কারণ গীতায় (২।২৩) উক্ত হইয়াছে ঃ

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

'শস্ত্র এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইঁহাকে বিগলিত করিতে পারে না এবং বায়ু ইঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না।' ইনি অচ্ছেদ্য,

অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, অবিকারী এবং অবিনশ্বর; দেহের নাশ হইলেও আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। যাহা-কিছু দেশ ও কালের অধীন তাহাই ধ্বংসশীল, মৃত্যুর অধীন ও নশ্বর। যে সকল বস্তুর আকার আছে তাহার মৃত্যুও আছে; কেননা: "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" (২।২৭), জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই ধ্বংস আছে। আমাদের জড়শরীরের জন্ম হইয়াছে, সেজন্য ইহার মৃত্যুও আছে। দেহের আকার সর্বদা দেশ ও কালের অধীন, কিন্তু আত্মার কখনও মৃত্যু হইতে পারে না, ইনি অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত এবং দেশ ও কালের অতীত। আত্মা কখনও দেশ ও কালের অধীন নহেন। যদি আমাদের আত্মার সৃষ্টি বা জন্মের বিষয় অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে আমরা কখনও উঁহার সৃষ্টির সন্ধান পাইব না; সুতরাং ইহা সত্য যে, আত্মা আদিরহিত এবং অন্তহীন। যে সমস্ত পদার্থ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদেরই কেবল পরিবর্তন হইবে এবং কালে তাহাদেরই নাশ হইবে, কিন্তু আত্মা চিরকাল একভাবেই থাকিবেন, কারণ আত্মা অজর, অমর ও শাশ্বত।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এই চৈতন্যময় আত্মা এক—না বহু? এই এক জড়পদার্থ বা অনাত্মা সম্বন্ধেও আবার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, জ্ঞেয় বিষয়, জড়জগৎ বা অনাত্মা —যদিও দেশ এবং কালের অধীন থাকিয়া নানাভাবে প্রতীয়মান হইয়া থাকে তথাপি উহা পরমার্থতঃ এক বস্তু ও নিত্য। বেদান্তের মতে জ্ঞেয় বিষয় বা জগৎ বিচিত্র ও নানা, কিন্তু জগতের জ্ঞাতা, বিষয়ী বা আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। সেই সর্বব্যাপী জ্ঞাতারূপ পরমাত্মা এই

নিখিল বিশ্বের প্রাণরূপে বিদ্যমান এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাত্মাসমূহ তাঁহারই অংশরূপে প্রকাশিত। সেই বিরাটপুরুষ জীবাত্মারূপ অংশসমূহের সমষ্টি। সেই বিরাটপুরুষই অনাদি কাল হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র বিষয়ী ও জ্ঞাতা; তিনিই একমাত্র বিশ্বাত্মা অংশরূপে অবস্থিত। তিনিই এক, অদ্বিতীয় বা অনন্তসত্তারূপ অখণ্ড-চৈতন্যসমুদ্র, তাঁহাতেই অসংখ্য আবর্তের ন্যায় এই ব্যষ্টি জীবাত্মাসমূহ রহিয়াছে। সেই বিরাটপুরুষই আবার প্রথমে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া ঋগ্বেদে বর্ণিত: "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাত পতিরেক আসীৎ"—ইনি বিশ্বের বিধাতা ও পতিরূপে ব্রহ্ম হইতে প্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনিই নির্গুণ-পরব্রহ্মের সর্বপ্রথম এবং সর্বোত্তম বিকাশ, আবার ইনিই সগুণ-ব্রহ্ম। এ ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ও নিমিত্তকারণ। ইঁহাকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতি ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই ভাবটি গীতায় আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে, যেমন: "মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্" (১৪।৩)। ইনি জ্ঞাতা, বিষয়ী, আত্মা এবং চৈতন্যকে জ্ঞেয়, বিষয়, অনাত্মা ও জড়জগৎ হইতে পৃথক করিয়াছেন। উপনিষদে পুনরায় বলা হইয়াছে: "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্মেতি।"[১১]

ব্রহ্ম হইতেই বিশ্ব সৃষ্টি, তাঁহাতেই স্থিত হইয়াছে, তাঁহাতেই লীন হইবে। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান। জীবসমষ্টি অপেক্ষা ইনি অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের জীবের শক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমাদের জ্ঞান যেরূপ সীমাবদ্ধ, আমাদের

১১। তৈত্তিরীয়-উপনিষৎ ৩।১

শক্তিও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বরের মহতী শক্তির কোন আদি ও অন্ত নাই। ঈশ্বরের মহাশক্তির বিকাশ সর্বত্রই এবং আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শক্তি নিহিত ও ক্রিয়াশীল। ব্রহ্মই অনন্ত জ্ঞানের আধার এবং ইনিই স্বরূপতঃ আমাদের আত্মার আত্মা।

সকলের এই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূজা ও ধ্যান করা কর্তব্য। ধ্যানের সহায়তায়ই আমরা জীব ও জগতের এবং পরমেশ্বরের সহিত কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিব। এই পরমেশ্বরই নিত্য ও সকলের আধার। যেমন,

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥[১২]

ইনি সমস্ত চলমান বস্তু এবং অনিত্য নাম ও রূপাদির মধ্যে একমাত্র নিত্যবস্তু। ইনিই সমস্ত চেতন পদার্থের একমাত্র আকরস্বরূপ। ইনি একই বস্তুকে বহুভাবে প্রতিভাত করান এবং বিশ্বের সকল জীবের অন্তরস্থিত সমস্ত কামনাকে পূর্ণ করেন। ইহাকে হৃদয়াকাশে উপলব্ধি করিতে পারেন যে সকল জ্ঞানী তাঁহারা এই জীবনেই শাশ্বতী শান্তি লাভ করেন।

১২। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।১২-১৩

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গোচর স্থূল এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম জগতের সকল পদার্থতে পরিব্যাপ্ত আছেন। সেই পূর্ণ অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম হইতে এই দৃশ্যমান জগতকে বাদ দিলেও যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও সেই অনন্ত ব্রহ্ম। ইহাতে ব্রহ্মের পূর্ণতার কোন হানি হয় না। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি!

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ আত্মানুভূতি ॥

ঈশ্বরের উপলব্ধি অপেক্ষা আত্মজ্ঞানের কথাই বহুলভাবে ভারতবর্ষের জন-সমাজে আলোচিত হয়। আত্মজ্ঞানই সেই নির্বিশেষ আত্মা বা পরমপুরুষের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করে। সাধারণতঃ 'আত্মা' বলিতে আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' বা 'আমি'-কেই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু 'আত্মা' বা 'আত্মানুভূতি' কেবল আমাদের এই 'অহং' বা 'আমি-'র জ্ঞান নয়, 'আমি'-র জ্ঞানকে যাহা প্রদীপ্ত করে তাহাই আত্মা। ইহা সত্য যে, আমাদের 'অহং' বা জীবাত্মাই এই সকল কার্যের কর্তা, সকল চিন্তার মননকর্তা এবং জ্ঞাতারূপে আছেন। যিনি শরীর এবং মনের সকল কার্য সম্পাদন করেন তিনিই 'অহং' বা 'জীবাত্মা' বলিয়া পরিচিত, কিন্তু জীবাত্মা সকলজ্ঞানের একমাত্র প্রতিষ্ঠা-রূপ পরব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বমাত্র। পরমাত্মার চিদ্‌শক্তি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় জীবাত্মা শক্তিমান হয় এবং শারীরিক ও মানসিক সকল কার্য করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং আত্মা বা আত্মজ্ঞান বলিতে কেবল দেহাত্মাভিমানী 'অহং'-জ্ঞানকে না বুঝিয়া মহান্ আত্মার বা ব্রহ্মের জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে।

জীবের যথার্থ স্বরূপই পরমাত্মা। তবে সাধারণতঃ জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ বলিয়া কল্পনা করা যায়। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন: "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত সনাতনঃ।"[১]

১। গীতা ১৫।৭

সুতরাং জীবাত্মা বিশ্বের অধিষ্ঠানস্বরূপ বিশ্বাত্মার সহিত অভিন্ন। সেই মহান্ আত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের পারমার্থিক সত্তা এবং দেশ ও কালের অতীত 'পরমাত্মা' নামে অভিহিত। ইনি আসলে নিরাকার এবং অপরিবর্তনশীল পরব্রহ্ম।[২]

পরমাত্মা যখন ব্যষ্টিভাবে 'অহমস্মি' এই ক্ষুদ্র 'আমি'-জ্ঞানবিশিষ্ট জ্ঞাতারূপে প্রকাশিত হন তখন ইঁহাকে 'জীবাত্মা' বলে। ইনিই যখন আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞেয় পদার্থরূপে প্রতিভাত হন তখন তাঁহাকে 'জড়-পদার্থ' বলে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম, জড়পদার্থ ও জীবাত্মা এই দুই হইতে অতীত। ইনিই অন্তর্যামীরূপে জীবাত্মার অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান এবং ইনিই আমাদের সত্তার প্রকৃত স্বরূপ ; ইনিই আত্মা। যখনই আমাদের এইরূপ আত্মানুভূতি হইবে তখনই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে, তখনই বহির্জগতের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ তাহাও বুঝিতে পারিব। স্বরূপে আত্মাকে সাক্ষাৎকার করাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

কেহ কেহ মনে করেন, আত্মার বিলুপ্তিসাধনই বেদান্ত-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়।[৩] বেদান্তের মতে আত্মার কখনও ধ্বংস নাই, আত্মা অবিনাশী। যদি আত্মার বিনাশসাধনই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে আত্মা পরিবর্তনশীল ও বিনাশশীল ও বিনাশী হইতেন, বা আত্মা ও ব্রহ্ম কখনও অভিন্ন হইতেন না। পক্ষান্তরে বেদান্ত-দর্শন এই কথাই বলে যে, আত্মা অপরিবর্তনশীল ও অবিনাশী।

২। 'ব্রহ্ম' বলিতে 'ব্যাপকত্বাদ্ ব্রহ্ম'—যিনি সর্বব্যাপক তিনিই ব্রহ্ম। আবার বৃহৎব্রহ্ম—বৃহৎ বলিয়া ব্রহ্ম।

৩। আত্মার পরিবর্তে বরং বুঝিতে হইবে—আমি-র বিলুপ্তি সাধনই মুক্তি।

সুতরাং ইহা সত্য হইলে কি প্রকারে আত্মার আত্যন্তিক অভাব বা বিনাশের কথা উঠিতে পারে? ব্রহ্মের বিনাশ-সাধন যেরূপ অসম্ভব, তেমনি আত্মার বিনাশসাধনও অসম্ভব। সুতরাং আত্মার নাশ কখনও জীবনের মুখ্য-উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না।

একমাত্র আত্মানুভূতি বা আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা পরমসত্যের উপলব্ধি করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারি। বেদে ইহা সর্বোচ্চ জ্ঞান বলিয়া বিদিত। গ্রীক-দার্শনিক সক্রেটিস্ যখন ডে্লফির মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "পরমজ্ঞান কি?" তখন প্রত্যুত্তরে তিনি দৈববাণীতে শুনিতে পাইয়াছিলেন: "তোমার আত্মাকে জান"— 'আত্মানং বিদ্ধি'। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে ভারতে এই আত্ম-জ্ঞানের মহিমা বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। বেদান্ত বা বেদের জ্ঞানকাণ্ডের কথাও তাই যে, আত্মজ্ঞানই জীবনের চরমলক্ষ্য। আমরা যদি ঈশ্বরলাভ করিতে বা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমাদের আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে; আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এই প্রশ্ন জাগাইতে হইবে: 'আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি? মৃত্যুর পরেই বা আমাদের কি হইবে?' এই প্রশ্নগুলির প্রয়োজনীয়তা আছে।[৪] সাধারণ লোক এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে পারে না, কারণ তাহাদের মন দেশ-কালযুক্ত জাগতিক ব্যাপারেই লিপ্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগরে কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ

৪। এই প্রশ্নের নাম জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মসূত্রে আছে: 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'—ব্রহ্মকে জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা।

করিবার জন্য ব্যাকুল হন, জাগতিক পদার্থ-বিষয়ে তাঁহারা বিতৃষ্ণ ও যতক্ষণ বিশ্বের প্রকৃত রহস্য জানিতে না পারেন ততক্ষণ তাঁহারা চেষ্টা করেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ঐ সমস্ত প্রশ্নগুলির সমাধান করাই তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। এই জড়জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া যতই স্তরে স্তরে মানুষ আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহারা পরমার্থ সত্যের নিকটবর্তী হন এবং পরিশেষে সেই দেশকালাতীত সত্যকে উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারেন যে, সেই সত্যবস্তুই তাঁহাদের আত্মা হইতে অভিন্ন। আত্মাই বিশ্বের একমাত্র কারণ ও কেন্দ্র। দ্রষ্টারূপে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ও বাহ্যজগৎকে একটি সুবৃহৎ বৃত্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই বৃত্তের পরিধি যেন স্থূল ও জড় পদার্থসমূহ এবং ইহার কেন্দ্র অবিনশ্বর আত্মা। বেদান্ত বলে,—এই আত্মা কখনও কাহারও বা কোন পদার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না; ইনি অসীম, অনন্ত ও অবিচ্ছন্ন; ইনি দেশ ও কালের অতীত। কালের দ্বারা আত্মাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, বা দেশের দ্বারা আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করা যায় না, জগতের ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের মতে, ঈশ্বরই এই নিখিল বিশ্বের একমাত্র আধার বা অধিষ্ঠান। আত্মা নিজেই এই সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে বেদান্ত বলে, আত্মা ও ঈশ্বর অভিন্ন। যে মুহূর্তে আত্মানুভূতি বা ঈশ্বরানুভূতি হইবে সেই মুহূর্তেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র এবং বহু দূরবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ—যে সমস্ত জ্যোতিষ্ক হইতে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে আসিতে শতসহস্র বৎসরেরও অধিক সময় লাগে—এই আত্মা সে সমস্ত বস্তুতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাহার পর পাঞ্চভৌতিক স্থূলজগতে অথবা সূক্ষ্ম

মনোরাজ্যেও যেখানেই যেকোন প্রকারের সত্তা বা অস্তিত্ব বর্তমান সেখানেই আত্মার প্রকাশ আছে বুঝিতে হইবে। যে চৈতন্যের দ্বারা আমরা বহির্জগতের সত্তা অনুভব করি এবং যাহার দ্বারা আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহকে অনুভব করিতে পারি তাহাই প্রকৃত আত্মা। ইনি আমাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থিত না থাকিলেও আমাদের মন ও বুদ্ধি তাঁহাকে ধরিতে পারে না। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় ঈশোপনিষদে বলা হইয়াছে : 'আত্মা সর্বসময়েই একরূপ ও সর্বপ্রকার স্পন্দনের অতীত, অর্থাৎ নিশ্চল। ইনি মন অপেক্ষাও অধিক বেগবান্। ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। সেই আত্মা নিশ্চল হইলেও অতি দ্রুতগামী মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।'[৫] এই আত্মাই যাবতীয় চিত্তবৃত্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মূলকারণ।

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, সমগ্র জগৎ জড় ও প্রকৃতির শক্তির সমবায়ে উৎপন্ন হইয়াছে।[৬] আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, জড়জগৎ কতকগুলি পদার্থের স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই পদার্থগুলির প্রকৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর কম্পন বা স্পন্দন নিরবচ্ছিন্ন চলিতেছে।[৭] যাহা আমাদের নিকট উত্তাপ, আলোক, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, রস বা

৫। অনেজদেকং মনসো জবীয়ো, নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ, তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪
—ঈশোপনিষৎ

৬। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিকেই জড় ও প্রাণহীন বলা হইয়াছে প্রাণ ও চৈতন্যবান পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলনে সৃষ্টি হয়।

৭। কঠোপনিষদে সমগ্র জগতকে কম্পনশীল বলা হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির যোগ্য কোনও বিষয় বলিয়া পরিচিত তাহা সেই অজ্ঞাত পদার্থের স্পন্দনাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ বলেনঃ "এক সেকেণ্ডে বত্রিশটি বায়ুর কম্পন হইতে শব্দ প্রথম কর্ণগোচর হয় এবং যখন এই কম্পনের হার প্রতি সেকেণ্ডে তেত্রিশ হাজারের কিছু কম হয় তখন আর শব্দ কর্ণগোচর হয় না। উত্তাপ ও আলোকরশ্মির কম্পন এত দ্রুত হয় যে, উহা প্রায় ধারণার মধ্যেই আসে না। পনেরটি রাশির দ্বারা তাহাদের কম্পনের হার (প্রতি সেকেণ্ডে) নিরূপিত হয়। আবার সম্প্রতি 'রেডিয়ম্' (Radium) নামক একটি মৌলিক ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহার কম্পনের সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে নব্বই লক্ষের দশ লক্ষ গুণের দশ লক্ষ গুণ (Nine millions of millions of millions) অপেক্ষাও অধিক বলা হইয়াছে।" সমস্ত জগৎটাই পরমাণুর কম্পনবিশেষ। কিন্তু এই কম্পন-রাজ্যের বাহিরে এবং প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির মূলে সেই একই পরমসত্য আত্মা আছেন ও সকলকে প্রকাশ করিতেছেন। আত্মচৈতন্যের সাহায্যেই আমরা কম্পন বা স্পন্দনের অস্তিত্ব জানিতে পারি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এই জগৎ যে স্পন্দন ছাড়া কিছু নহে, তাহা কে জানিতে পারিল? স্পন্দন কি আপনাকেই আপনি জানিতে পারিল? না, তাহা হইতেই পারে না। গতি হইতে গতিই সৃষ্টি হয়, গতি ভিন্ন অন্য আর কিছু সৃষ্টি হইতে পারে না এবং ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির এই চিরন্তন নিয়ম বৈজ্ঞানিকগণ সমর্থন করেন। সুতরাং গতি হইতে গতি ভিন্ন জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হইতে পারে না; গতি বা স্পন্দনের ফলও জ্ঞান নহে; জ্ঞান স্পন্দন

ব্যতীত অন্য পদার্থ। ইহা আমাদের বুদ্ধিকে আলোকিত করিয়া গতি বা স্পন্দনের অস্তিত্বকেই জানাইয়া দেয়।

ঈশোপনিষদে আছে ঃ 'অনেজদেকং', অর্থাৎ যাহা স্পন্দন অর্থাৎ বিকারবিহীন তাহাই আত্মা। নিজের মধ্যে অনুসন্ধান কর এবং দেখ কোথায় সেই স্পন্দনের জ্ঞাতা ও স্পন্দনরহিত বস্তু রহিয়াছেন। এই বস্তু মন অপেক্ষাও বেগবান্—'মনসো জবীয়ো'। আমরা জানি যে, জগতের মধ্যে মনই সর্বপেক্ষা দ্রুতগামী। আমাদের চিন্তাশক্তি বিদ্যুৎ অথবা অন্য কোন পার্থিব শক্তি অপেক্ষাও দ্রুতগামী। স্যার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ বলেন ঃ "মস্তিষ্ক হইতে চিন্তার কম্পনগুলি যে কেন্দ্র হইতে বহির্গত হয় সেই স্থানে ঐ কম্পনের কোনও প্রকার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে, কারণ উহা অতিসূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের দ্বারা দৃষ্ট হয়।" তিনি আরও বলেন ঃ "যদি আমরা এমন কোনও শক্তির ধারণা করিতে পারি যে, ঐ শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে ইংরাজী সংখ্যা হিসাবে সহস্র সহস্র ট্রিলিয়ন বার[৮] স্পন্দন উৎপন্ন করিতে পারে এবং ইহার উপর আমরা যদি আরও এই ধারণা করি যে, এই কম্পনগুলির গতি তাহাদের গতির বেগের সহিত সমানভাবে চলে তাহা হইলে একটি চিন্তাপ্রবাহ সময়ের অতি ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেই পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আসিতে পারে।"

আমরা এখান হইতে ইংল্যাণ্ড কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের সহিত বেতারবার্তা অবলম্বনে অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদ আদানপ্রদান করিতে পারি; কিন্তু এই বেতারবার্তার গতি অপেক্ষা চিন্তাপ্রবাহের গতি কিন্তু আরও দ্রুত। ঐস্থানে

৮। একের ডাইনে ১২টি শূন্য বসাইলে যে সংখ্যা হয় তাহাকে ট্রিলিয়ন (trillion) বলে।

উপবিষ্ট যে কোন ব্যক্তির মন বরাবর সূর্য বা সূর্যমণ্ডল ছাড়াইয়া যেখানে বিদ্যুৎপ্রবাহ যাইতে পারে না এইরূপ অসীমের দেশে যাইতে পারে এবং এই কার্য একটি পলকের মধ্যেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। 'সময়' বা 'কাল' মনের মধ্যেই বর্তমান। 'সময়' বা 'কাল' বলিতে চিন্তাধারার ক্রমকেই বুঝায়। একটি চিন্তার পর আর একটি চিন্তার প্রকাশ হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশকেই (স্থানকে) 'সময়' বা 'কাল' বলে। সুতরাং সময় বা কাল মনোরাজ্যেরই অধীন। যাহা এই মন অপেক্ষাও দ্রুতগামী তাহাই আত্মা। আমাদের চিন্তাপ্রবাহ অপেক্ষাও আত্মা দ্রুতগতিশীল। মন অর্থাৎ মনের চিন্তাধারা যেখানে যাইতে পারে না, আত্মা সেখানেও যাইতে পারেন; আত্মা সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। এই মনের পশ্চাতেই আত্মা আছেন। সুতরাং মনের সমস্ত ক্রিয়াশক্তি অপেক্ষা আত্মার গতি ক্ষিপ্রতর বা দ্রুততর। জ্ঞাতাস্বরূপ আত্মার সাহায্য ব্যতীত মন কোথাও যাইতে পারে না। আত্মার সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেই মন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়।

উপনিষদ বলে: "নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ;" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি সেই আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না, কেননা আত্মা অতীন্দ্রিয় বস্তু আর সেইজন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিয়াই তিনি বিরাজ করেন। ইন্দ্রিয়গণ আত্মার রহস্য ভেদ করিতে পারে না, বা উহাদের শক্তিসমূহ আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করিতে অক্ষম, কারণ উহারা দেশ ও কালের দ্বারা আবদ্ধ। সেইজন্য দেশ ও কালের যিনি জ্ঞাতা তিনিই প্রকৃত-পক্ষে ইন্দ্রিয়রাজ্যের বাহিরে অবস্থান করেন। যেমন, যখন আমরা সূর্যকে দেখি তখন ঐ দৃষ্টি আমাদের 'অহং'-জ্ঞানের

বা আত্মচৈতন্যের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কিছু দেখিতে হইলে 'আমরা কিছু দেখিতেছি' এই ব্যাপারটি আমাদের মনে প্রথমে জাগরূক হওয়া প্রয়োজন। আবার এই জ্ঞান হওয়াও আত্মার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও বোধির মূলকারণ আত্মা, এই আত্মা হইতে মন ও চক্ষু বিচ্ছিন্ন হইলে আবার সূর্যকে দেখা যাইবে না। ঐ জ্ঞানের ও চৈতন্যের কারণ যে আত্মা তাহারই শক্তিতে আমাদের মন ক্রিয়াশীল হয়, ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য সম্পাদন করে এবং দেহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে। সেজন্য ঈশোপনিষদে আমরা দেখি ঃ "আত্মা সচলও বটে, আবার নিশ্চলও বটে; অতি দূরবর্তী হইয়াও অত্যন্ত সন্নিকটে আছেন। তিনি নিখিল জগতের অন্তরে ও বহির্ভাগে বিদ্যমান্ আছেন।"[৯] যখন দেহ একস্থান হইতে অন্যস্থানে যায় তখন আমাদের চৈতন্যরূপ আত্মাকে সচল বলিয়া মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে আত্মা নিশ্চলই, কারণ আত্মা যাইবেনই বা কোথায়? আত্মা কোথাও তো যাইতে পারেন না। কেননা আত্মা চৈতন্যরূপে বিশ্বের সর্বত্রই বর্তমান, সুতরাং যাওয়া-আসা তাঁহার নাই। যখন একটি ঘটকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাই তখন ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ বা দেশকে সচল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ঐ ঘটাকাশ কি চলে? না, তাহা সম্ভব নহে। তাহা হইলে যে বস্তুটি স্থানান্তরিত হইতেছে তাহা কি? তাহা আমরা জানি না। কিংবা ঘটের আকাশ স্থানান্তরিত হইতেছে বলিয়াই অনুমিত হয় যে, ঘট চলে। কিন্তু আসলে সেই আকার আবার সীমাবদ্ধ আকাশ বা দেশ ব্যতীত অন্য কিছু

৯। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥…ঈশোপনিষৎ ১।৫

নহে। সুতরাং ইহাও বলা যাইতে পারে, যদি আকাশ বা দেশ অচল হয় তবে কোন আকৃতিবিশেষেরও গতি হইতে পারে না। সুতরাং ইহা প্রহেলিকা বা রহস্যপূর্ণ বলিয়াই মনে হয় এবং যখনই আমরা ইহার উত্তর দিতে চেষ্টা করি তখনই প্রতি পদে সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়ে।

সমগ্র মনুষ্যজীবন একটি রহস্য। আমরা প্রকৃতির অবস্থা বুঝিয়া এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিবার চেষ্টা করি; কিন্তু তাহাতে আমরা আরও বিভ্রান্ত হই। বিজ্ঞানও আমাদিগকে এই দিকে কোন প্রকার সাহায্য করে না। বিজ্ঞানের পথে কিছু অগ্রসর হইয়াই বরং আমরা পথহারা হইয়া পড়ি। সুতরাং তখন আমাদের কি করিতে হইবে, বা কোথায় যাইতে হইবে তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক জ্ঞানের এইরূপই অবস্থা হয়। জীবনের রহস্যটিকে যথার্থরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই আংশিক বিকাশ মাত্র। ঐ জ্ঞান প্রকৃত আত্মারই যথার্থ স্বরূপ।

যাহা হউক আপেক্ষিক ও জাগতিক জ্ঞানের দ্বারা এই বিশ্বচরাচরের রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না। বিশ্বের অধিষ্ঠানরূপ সেই সত্যবস্তুকে জানিতে বা উপলব্ধি করিতে হইলে বাহ্য প্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া অনন্ত জ্ঞানের রাজ্যে আমাদের প্রবেশ করিয়া রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। এই প্রকৃতিকে সংস্কৃত ভাষায় 'মায়া' বলে। এই মায়ার জন্যই আমাদের যত ভ্রম হয়, অথচ এই মায়ার রাজ্যেই আমাদিগকে বাস করিতে হয়। আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনও ঐ মায়া বা প্রকৃতিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাহ্য প্রকৃতিতে যতই আমরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িব ততই আমাদের

ভ্রম[১০] হইবে এবং সেকারণ আমরা সত্যকার মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিব না। বৈজ্ঞানিকগণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তগুলির দ্বারা আসল সমস্যার কোনই মীমাংসা হয় না। বিজ্ঞানের মতে প্রত্যেক বস্তুর চরম গন্তব্যস্থান অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। বেদান্ত এখানে বলেন যে, কেবল বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা না করিয়া আত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে সকল রহস্য ও অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং পরমসত্যকে তখনই মানুষ উপলব্ধি করে। আমাদের দেহ যখন গতিশীল হয় তখন মায়ার জন্য মনে হয় আত্মা গতিশীল, কিন্তু আত্মা কূটস্থ[১১] ও স্থির। আবার 'মায়া' দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আত্মা বহুদূরে অবস্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের কাছে যাহা কিছু আছে তাহাদের অপেক্ষা আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্তী বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আত্মা বিশ্বের সর্ববস্তুর অপেক্ষাও আমাদের সমীপবর্তী; ঈশোপনিষদে আছেঃ "তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক স্তরে অন্তরে ও বাহিরে আছেন। কিন্তু উহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে একই বস্তু বাহিরেও থাকে আবার ভিতরেও থাকে? অথবা বলা যায়, যদি আত্মা কোন বস্তুর অন্তরে থাকেন তাহা হইলে আবার সেই বস্তুর বাহিরে তাঁহার থাকা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? কিন্তু ব্যাপক চৈতন্যের পক্ষে ইহা সম্ভব; কারণ আমরা দেখি

১০। এই ভ্রমের নাম মিথ্যাজ্ঞান—যাহা সত্য বা যথার্থ জ্ঞানের বিপরীত। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন 'মিথ্যা প্রত্যয়'।

১১। 'কূটস্থ' বলিতে অচল অবস্থা। কর্মকার যখন কোন লৌহ দ্রব্য তৈয়ারী করে তখন যে স্থির লৌহবস্তুর উপর রাখিয়া আঘাত করে তাহাকে 'কূট' বলে।

যে, দেশ বা আকাশ সকল জিনিসের ভিতরে ও উভয় দিকেই থাকিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলি, যেমন একটি ঘর চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। দেশ বা আকাশ-বস্তুটি ঘরের মধ্যেও আছে আবার বাহিরেও আছে। কিন্তু তাহা হইলে প্রাচীর-গুলি কি? উহারা কি দেশ বা আকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন বা বিভিন্ন? উত্তরে বলিতে হয়—না, প্রাচীরগুলি সীমাবদ্ধ আকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে; আকাশের সাহায্যেই উহারা থাকে ও আছে; সুতরাং ঐ প্রাচীরগুলিকে আকাশই[১২] বলিতে হইবে। প্রাচীরে স্থিত আকাশ খণ্ড ঘরের মধ্যস্থিত আকাশটীকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু বাস্তবিক কি প্রাচীর ঐরূপে আকাশকে আবদ্ধ রাখিতে পারিয়াছে? উত্তরে বলিতে হয়—না, কারণ গৃহমধ্যস্থ দেশ বা আকাশ বাহিরেও ব্যাপ্ত আছে। আমরা কি এই অনন্ত আকাশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারি? না, পারি না। এইরূপে মনের দ্বারাও আমাদের আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলে আমরা অকৃতকার্যই হইব, কারণ মন এত বড় নহে বা এত শক্তিশালী নহে যে, উহা সর্বব্যাপী আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের শক্তিসমূহও এই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া পঞ্চভৌতিক আকারবিশিষ্ট কোন পদার্থের দ্বারাই আত্মাকে বিভক্ত করা যায় না, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই আত্মার সত্তাতেই সত্তাবান। অতএব এই আত্মাকে যখনই আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই ইহাকে অসীম ও অনন্ত বলিয়া[১৩] বোধ হইবে। সাধারণত

১২। 'আকাশ' কিনা স্থান বা অবকাশ, অর্থাৎ দেশ।

১৩। 'কূটস্থ' বলিতে অচল অবস্থা। কর্মকার যখন কোন লোহক্

বলিয়া থাকি—আমরা সসীম জীব, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহি। একই সসীম ও অনন্ত সত্তা বিচিত্র শান্ত ও সসীম আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছেন। এই সসীম আকারগুলি আবার দেশ বা আকাশেই অবস্থান করিয়া থাকে; আকাশের বাহিরে ইহারা থাকিতে পারে না। সেই রূপ ভিন্ন ভিন্ন জীব সেই অনন্ত আকাশসদৃশ নির্বিশেষ আত্মার মহান্ সত্তাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

উপনিষদে আছে: "যে ব্যক্তি আত্মাতে সর্বভূতকে দর্শন করেন এবং সর্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন তিনি কাহারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।"[১৪] যিনি আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকল বস্তুকে আত্মা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করেন, যিনি সর্বত্র সকল পদার্থে চিরপবিত্র আত্মার সত্তা ও মহিমা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার নিকট কিছুই আর উপেক্ষণীয় বস্তু থাকে না। সীমাবদ্ধ আপেক্ষিক জ্ঞান হইতেই ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং আপেক্ষিক জ্ঞানই সকলকে এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। কিন্তু যখন আমরা অপরের মধ্যে আমাদেরই আত্মার সত্তা উপলব্ধি করি তখন আর কিরূপে অপরকে ঘৃণা করিতে পারি? আমাদের নিজের আত্মাকে অথবা নিজেকে ঘৃণা করা যেরূপ অসম্ভব, অপরের আত্মাকে বা অপরকে ঘৃণা করাও সেইরূপ অসম্ভব। আত্মজ্ঞান-জনিত বিভিন্ন ফলের মধ্যে এই ঘৃণা না করাও একটী ফলস্বরূপ। আত্মজ্ঞানের অবস্থায় ঘৃণার ভাব একেবারেই থাকিতে পারে না, আর ঘৃণার ভাব চলিয়া গেলে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি স্বার্থ-

---

দ্রব্য তৈয়ারী করে তখন যে স্থির লৌহ বস্তুর উপর রাখিয়া তাহাতে আঘাত করে, তাহাই 'কূটস্থ'।

১৪। ঈশোপনিষৎ, ১।৫

জনিত কুপ্রবৃত্তিগুলিও সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া যায়। সুতরাং তখন অবশিষ্ট থাকিবে কি? আত্মজ্ঞানের প্রকাশ হইলে ঘৃণার ভাব ও স্বার্থজড়িত মানবীয় ভালবাসা দূর হয় এবং তাহার পরিবর্তে আত্মজ্ঞানীর হৃদয়ে নিঃস্বার্থ ভগবৎ প্রেম ও সর্বজীবে ভালবাসা স্ফুরিত হয়। যথার্থ প্রেম অভেদ বা একত্বভাবের প্রকাশক। যেমন দেহের উপর মমত্বের ভালবাসার জন্য আমরা দেহকে আত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করি,[১৫] তেমনি পরমাত্মাকে ভালবাসার জন্য আমরা নিজেকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন মনে করি। যদি সেই পরমাত্মাকে আমরা অপরের মধ্যেও দর্শন করি তাহা হইলে তাহাকেও নিজের আত্মার ন্যায়ই না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আমরা 'তোমাকে তুমি যেরূপ ভালবাস, তোমার প্রতিবেশীকেও সেরূপ ভালবাসিও—যীশু-খৃষ্টের এই পবিত্র বাণী[১৬] বা উপদেশের অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। যীশুখৃষ্টের এই উপদেশ যে একেবারে অনন্যসাধারণ তাহাও নহে। বেদান্ত অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই সত্য শিক্ষা দিয়া আসিতেছে। তবে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী খৃষ্টানগণ নাকি বলেন যে, যীশুখৃষ্টই কেবল এই শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, ঐ সত্য বেদান্তেরই মূলনীতি এবং ভিত্তিস্বরূপ।

১৫। আচার্য শঙ্কর অধ্যাসভাষ্যের গোড়ায়ই এই ধরণের ভ্রমের পরিচয় দিয়াছেন।

সীমা ও অন্ত বা শেষ থাকিলে তবে সসীম ও শান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু যাহার সীমা ও শেষ নাই তাহা অনন্ত ও অসীমই হয়।

১৬। 'Love thy neighbour as they self' বলেছেন যীশুখৃষ্ট। অপরকে আপনার ন্যায় উপলব্ধি করিলে তবেই ভালবাসার রূপ সার্থক হয়।

দেহ, মন ও বাক্যে একত্বভাবে প্রকাশের নামই 'প্রেম' উপনিষদে আছে ঃ "যে সময় সর্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মার সহিত সকল ভূতকে যখন অভিন্ন বলিয়া বোধ করা যায় তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর পক্ষে মোহই বা কি, শোকই বা কি ? অর্থাৎ তাঁহার শোক ও মোহ কিছুই থাকে না।[১৭]

আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সর্বভূতের সহিত একত্বানুভূতি হয়। যখন সর্বভূতকেই এক মহান্ বিশ্বাত্মার অভিন্নরূপ বলিয়া বোধ হয় তখন আর কোন ভয়ও থাকে না বা শোকও থাকিতে পারে না ; কারণ আত্মা ব্যতিরেকে তখন এমন কোনও পদার্থই আর অবশিষ্ট থাকে না—যাহার জন্য শোক করিতে হইবে বা দুঃখভোগ করিতে হইবে। যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান বা বহুত্বজ্ঞান থাকে ততক্ষণই শোক, দুঃখ ও ভয় ইত্যাদির উদয় হয়। যদি ভয় বা দুঃখজনক বিষয়গুলি সেই ব্যাপক আত্মার সহিত এক হইয়া যায় তাহা হইলে শোক ও ভয় কিছুই থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ 'আত্মার বাহিরে অন্য কোন বস্তু বা বিষয় আছে' এই জ্ঞান থাকিবে ততক্ষণ শোক, দুঃখ বা ভয়ের কবল হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিব না। সেইজন্য এক ও অদ্বিতীয় আত্মার জ্ঞানলাভ হইলে শোক, দুঃখ, ভয়, মোহ ও বিচ্ছেদ সমস্তই চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং ইহাই আত্মজ্ঞানের অন্যতম ফল।[১৮]

১৭। যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।।
—ঈশোপনিষৎ ৭

১৮। উপনিষদে আছে ঃ 'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ...' প্রভৃতি আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে সকল সংশয় দূর হয়।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদান্ত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। বেদান্তের মতে আত্মানুভূতি হইলে আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং'-জ্ঞানটির বিনাশ হয় এবং এই ক্ষুদ্র 'অহং' বা দেহাত্ম-বুদ্ধির লোপের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারপ্রসূত স্বার্থপরতাও দূর হয়। 'বিরাট অহং' বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই আমার, এই বোধ এবং 'ক্ষুদ্র অহং' বা দেহাত্মবোধ, এই দুইটির অর্থ বাস্তবিক এক নহে[১৯]। 'বিরাট অহং' বলিলে প্রকৃতপক্ষে আমরা পরমাত্মাকেই বুঝি এবং পরমাত্মাই আমাদের যথার্থ-স্বরূপ। আমাদের আত্মার যথার্থ-স্বরূপ ঐশী-শক্তিতেই পরিপূর্ণ। অতএব 'আত্মা' এই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা স্বরূপতঃ যিনি সেই ঐশীশক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বর তাঁহাকেই বুঝি এবং সেজন্য 'আত্মা'-র কথা বলিলে মানুষের আর স্বার্থপরতার ভাব উদিত হইবে না। এই আত্মা সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ বলিয়াছে ঃ

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মণীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥[২০]

অর্থাৎ জ্যোতির্ময়, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীররহিত, অক্ষত, স্নায়ুকেন্দ্র অথবা মস্তিষ্কের দ্বারা অস্পষ্ট, নির্মল নিষ্পাপ, ধর্মাধর্ম-বিবর্জিত, কবি (ভূতভবিষ্যদ্বর্তমানদর্শী), মণীষী (মনের প্রভু বা সর্বজ্ঞ), পরিভূ (সর্বোপরি বিরাজমান), স্বয়ম্ভু (উৎপত্তি বা হেতুরহিত, স্বয়ংপ্রকাশ) সেই পরমাত্মা সমস্ত পদার্থকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন এবং সংবৎসরাধিপতি

১৯। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'পাকা আমি, ও 'কাঁচা আমি'-র কথা বলিয়াছেন। পাকা-আমি যথার্থজ্ঞান এবং কাঁচা-আমি অজ্ঞান।

২০। ঈশোপনিষৎ ৮

প্রজাপতিগণকে স্ব-স্ব-কর্তব্য বিষয়সমূহ যথাযথরূপে দান করিয়াছেন।” এই পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ওতপ্রোতভাবে সর্ববস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বর্তমান।

আমাদের মন যেখানে যাইবে আত্মাও সেখানেই যাইবে, কারণ আত্মাকে ছাড়িয়া মন কখনই থাকিতে পারে না। বুদ্ধিকেও এই আত্মাই আলোক প্রদান করিতেছেন। এই আত্মা পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক এবং সর্বপাপরহিত। এখানেই কিন্তু আমরা খৃষ্টানমত হইতে বেদান্তমতের পার্থক্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। খৃষ্টানগণ বলেন, মানবের আত্মা জন্ম হইতেই পাপী; কিন্তু বেদান্ত বলে, আত্মা সর্বপাপবর্জিত ও চিরপবিত্র। বাস্তবিক এই শাশ্বতী শিক্ষা আমরা বেদান্ত হইতেই লাভ করি। তবে ইহার দ্বারা আমাদের এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, তাহা হইলে বেদান্ত মানুষকে পাপকর্ম করিতে উৎসাহ দান করে। বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্তই মানুষকে শিক্ষা দেয়, যেই মুহূর্তে আত্মজ্ঞান লাভ হইবে সেই মুহূর্তেই সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি দূর হইয়া যাইবে এবং পাপকর্ম হইতে বিরত হইয়া মানুষ চিরপবিত্র হইবে।

আত্মা মানবশরীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে অশরীরী ও অসীম। আসলে আত্মার কোন আকার নাই; অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় প্রকার আকার তাঁহাতে নাই। জগতে যে সকল সূক্ষ্ম আকার আছে এবং এমন কি সর্বোৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না এরূপ সূক্ষ্ম আকারও আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আত্মা সর্বপ্রকার আকারবর্জিত।[২১] কিন্তু আত্মাই আবার যে কোনও রূপ বা

২১। কেননা আকার বলিলেই দেশ ও কাল বুঝায়। কিন্তু আত্মার কোন দেশ ও কাল নাই।

আকার ধারণ করিতে পারেন ; সর্বপ্রকার রূপই আবার এই আত্মাতেই বিদ্যমান।

আত্মা শরীরস্থ স্নায়ুকেন্দ্রের এবং মস্তিষ্কের যাবতীয় ক্রিয়ার বহিঃপ্রদেশে অবস্থিত। জড়বাদীরা বলেন, মস্তিস্ক ও স্নায়ুকেন্দ্রসমূহের স্পন্দনের ফলে 'অহংজ্ঞান' বা 'আত্মবোধ' সৃষ্টি হয়। কিন্তু বেদান্ত সেকথা সমর্থন করে না। বেদান্তের মতে, স্নায়বিক শক্তিকেন্দ্রসমূহ বা মস্তিষ্কপ্রসূত শক্তিরাশি কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেহের পরিবর্তনে শাশ্বত আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না। স্থূলদেহের বর্ণের বা আকৃতির ভাবান্তর ঘটিতে পারে, ঐ দেহ রোগগ্রস্ত হইতে পারে, উহা বিকলাঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু ঐ রোগ বা অঙ্গহীনতা আত্মার কিছুই পরিবর্তনসাধন করিতে পারে না। বরং আত্মজ্ঞান মনুষ্যকে স্নায়ুদৌর্বল্য বা অপরাপর দেহাদি নিমিত্ত দুঃখ ও ব্যাধি হইতে মুক্ত করে, সেজন্য আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির স্নায়ুদৌর্বল্য, ব্যাধি বা দেহজনিত কোনও দুঃখ থাকে না।[২২]

'কবি'-শব্দ কাব্য-রচয়িতাকে বুঝায় ; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ 'সর্বদর্শী'। আত্মাই এই নিখিলবিশ্বের মহান্ 'কবি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রচলিত অর্থ অনুযায়ী তিনি "কবি" এবং তাঁহার কাব্য হইতেছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ঈশ্বরের মহিমা সুন্দর-রূপে বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাকে 'কবি' এবং বিশ্বরাজ্যকে তাঁহার রচিত 'কাব্য বলিলেই সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশ পায়। তাঁহাকে আবার সর্বাপেক্ষা নিপুণ চিত্রশিল্পী বলিয়াও অর্থ করা হইয়াছে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তকালে তাঁহার শিল্প নৈপুণ্য

২২। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও যাঁহারা পৃথিবীতে শরীর ধারণ করিয়া বাঁচিয়া আছেন তাঁহাদিগের নিকট দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি উপস্থিত হইলেও ইহারা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না।

আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই অসীম আকাশে যে আমরা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি দেখি তাহা সেই অনন্ত শক্তিমান শিল্পী বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য হস্তরচিত চিত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মার যথার্থ স্বরূপ কোন-কিছু ভাল-মন্দের ও ধর্মাধর্মের উপরে নির্ভর করে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, আত্মা ভাল ও মন্দের অতীত কিরূপে হইতে পারেন? আবার কেহ কেহ বলেন আত্মা কেবলই ভাল, মন্দের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। প্রকৃতপক্ষে ভাল এবং মন্দ দুইটি আপেক্ষিক শব্দ; ভালোর সত্তা মন্দের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। তাই আমরা একটিকে অপরটি হইতে বিচ্ছিন্নভাবে রাখিতে পারি না। যদি 'মন্দ'-শব্দটি জগতে না থাকে তাহা হইলে 'ভাল' শব্দটিও থাকিবে কিভাবে? একটিকে সরাইয়া লইলে অপরটিও থাকিবে না। ধর্ম ও অধর্ম এবং পুণ্য ও পাপ সম্বন্ধেও এককথা। ইহারা পরস্পর আপেক্ষিক শব্দ মাত্র, একটির অস্তিত্ব ভাবিলে অপরটির অস্তিত্বও ভাবিতে হয়। কিন্তু নির্বিশেষ পরমাত্মা আপেক্ষিক রাজ্যের বাহিরে; সুতরাং ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্য এবং ধর্ম ও অধর্ম কোন-কিছুই ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।[২৩]

উপনিষৎ বলে, পরমাত্মা ভিন্ন অন্য-কোন দ্রষ্টা বা অন্য কোনও জ্ঞাতা নাই। এই নিখিলবিশ্বের জ্ঞাতা আর কে হইতে পারেন? একমাত্র সর্বজ্ঞ আত্মাই জ্ঞাতারূপে আছেন এবং তিনিই সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তু জানেন। আমাদের অন্তরে জ্ঞাতারূপে বিরাজমান আত্মাই আবার সেই সর্বজ্ঞ

২৩। গীতায় আছেঃ 'সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা'। সুখ ও দুঃখ সমান জ্ঞান হয় আত্মজ্ঞান লাভ হইলে।

ঈশ্বরের নির্দেশক। অথচ বিশ্বের অধিকাংশ লোকই কিন্তু এই পরমসত্যকে জানে না। অধিকাংশ ধর্মপ্রচারকও ইহা শিক্ষা দেন না। কারণ তাঁহারা নিজেরাই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন না যে, ঈশ্বর যদি সর্বভূতের জ্ঞাতা হন তাহা হইলে আমাদের অন্তরস্থ জ্ঞাতা ও সেই বিরাট জ্ঞাতা পরমাত্মারই অংশমাত্র। বেদান্তও এই কথা শিক্ষা দেয় যে, প্রথমে শরীরস্থ জ্ঞাতাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্বগত সর্বজ্ঞ বিরাট পুরুষরূপী বিশ্বের জ্ঞাতাকে জানিতে পারা যাইবে।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা কখনও জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, কেননা তিনি সকল সময়েই বিষয়ী বা জ্ঞাতা।[২৪] লোকে যে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সেই ঈশ্বরকেই সকলের অন্তর্যামী ও বিরাট জ্ঞাতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। বেদান্তের মতে ঈশ্বর ও আত্মা অভেদ। ঈশ্বর আমাদের অন্তর হইতে অন্তরতম এবং এই অভেদ সম্বন্ধই উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু খৃষ্টান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মতে ও শাস্ত্রে ঈশ্বর মানুষের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন। তাঁহাকে এতদূরে স্থান দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরাশা মাত্র। কিন্তু বেদান্ত আমাদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যাহা-কিছু আছে তাহা অপেক্ষাও সন্নিকটে ঈশ্বরকে আনিয়া দিয়াছেন। যদিও এই আত্মা 'পরিভূ' বা সর্বব্যাপী তথাপি তিনি প্রকৃতির বাহিরেও সর্বত্র আছেন। তবে আত্মা সর্বভূতে অবস্থান করিলেও সকল ভূত ও আত্মা কিন্তু এক বস্তু নহে কেননা বৈচিত্র্যে ভেদভাব সৃষ্টি করে। জড়-জগতের পরিবর্তনশীল অবস্থাসমূহ এই

২৪। তবে বিষয়ী বা জ্ঞাতা থাকিলেই বিষয় ও জ্ঞান থাকিবে, কেননা ইহারা আপেক্ষিক। তাই আত্মা জ্ঞান ও জ্ঞাতার অতীত।

আত্মাকে বিকৃত করিতে পারে না। আত্মা প্রকৃতির সকল বিকার হইতে অতীত হইলেও আবার প্রকৃতির প্রত্যেক অণু ও পরমাণুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইনি 'স্বয়ম্ভূ', অর্থাৎ ইঁহার কোনও কারণ নাই এবং কার্যও নাই। পরমাত্মা কার্য-কারণসূত্রের সম্পূর্ণ অতীত ; অর্থাৎ পরমাত্মার কার্য ও কারণে কোনও ভেদ নাই। তবে ইহার কোনও কারণ না থাকিলেও ইনি সকল বস্তুর কারণস্বরূপ।[২৫] প্রকৃত কথা এই যে, পরমাত্মা কার্য-কারণ নিয়মের অধীন নহেন। পরমাত্মা অনাদি-কাল হইতে স্বয়ম্ভু অবস্থায় আছেন এবং ভবিষ্যতেও অনন্তকাল এইরূপই থাকিবেন। ইহার আদি ও শেষ কেহ দেখিতে পায় না। কোন বস্তুর আরম্ভ ও শেষ থাকিলে তাহা কালের অধীন। ইহাকে বিচার করিয়া অনুসন্ধান করাও মনোরাজ্যের ব্যাপার। এই বহির্বিকশিত বিশ্বের আদি ও অন্ত সম্বন্ধে অবশ্য অনুসন্ধান করিতে পারি, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা করা চলে না, কারণ আত্মা দেশ, কাল, নিমিত্ত, এবং চিন্তা, মনন প্রভৃতি কার্যের একেবারেই অতীত। তাই আত্মার আদিও নাই, অন্তও নাই, আর আদি ও অন্ত নাই বলিলে স্বীকার করিতে হয়, আত্মার জন্ম নাই।

আত্মা সর্বজ্ঞ। আত্মা জ্ঞানসমুদ্রবিশেষ। সকল আপেক্ষিক জ্ঞান ঐ সমুদ্রেরই আংশিক বিকাশ। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, লোকে ঈশ্বরকে যে সকল বিশেষণে বিশেষিত করে সেই সকল বিশেষণ আত্মা-সম্বন্ধেও বেদান্ত প্রয়োগ করিয়াছে। লোকে বলে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, নিত্য ও

২৫। অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মকে কার্য-কারণের এবং সকল অধি-ষ্ঠানেরও অতীত বলা হইয়াছে। যেহেতু কারণ ও অধিষ্ঠান বিশেষণ, তাহা অখণ্ড আত্মাকে বিশেষিত করে।

অসীম। বেদান্তেও আত্মাকে ঐরূপ বলা হইয়াছে। পরমাত্মা আমাদিগেরও আত্মাস্বরূপ। আত্মজ্ঞান হইলেই জানা যায় যেগুলি ঈশ্বরের বিশেষণ সেগুলিই আবার আত্মারও বিশেষণ —যদিও তাহারা আরোপিত। যাহারা এই পরমাত্মার উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহারা অজ্ঞানতার মধ্যে বাস করে এবং তাহাদিগকে অজ্ঞানজনিত দুঃখ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হয়।" তাহাদের সর্বদাই ভীত ও অসুখী থাকিতে হয়। মৃত্যুর নামেও তাহারা ভয় পায়। তাহারা এই পার্থিব জীবন ধারণের অন্তরায়গুলিকে ও দেহের নাশ বা মৃত্যুকে ভয় করে। তাহারা দেহাত্মবুদ্ধির জন্য জড়দেহে এরূপ গভীরভাবে আসক্ত হয় যে, উহা হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা সর্বদা হৃদয়ে পোষণ করে ও আপন জীবনকে দুঃখময় করে। তাহারা ইন্দ্রিয়-সুখ এবং পার্থিব ভোগবিলাস ভালবাসে এবং যখনই উহাদের অভাব হয় তখনই ম্রিয়মাণ ও হতাশ হইয়া পড়ে। তাহাদের বিবেচনায় এই পার্থিব জীবনে ঐ সমস্ত সুখভোগ ভিন্ন অন্য আর কোনও উচ্চতর লক্ষ্য বা আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। এইপ্রকার ব্যক্তিগণের জীবন সর্বদা ভয় ও অশান্তিপূর্ণই হইয়া থাকে। যাঁহারা ধনবান, তাঁহাদের চিত্তে ধন-সম্পত্তি নাশের ভয় থাকে এবং যাঁহাদের সুনাম ও উচ্চপদ আছে তাঁহাদেরও ঐ সকল নাশের ভয় আছে। সাধারণ লোকের জরা, রোগ ও মৃত্যুভয়জনিত দুঃখভোগ তো আছেই। বাস্তবিক এই শ্রেণীর লোক কি কখনও জগতে যথার্থ সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে সক্ষম হইতে পারে? কখনই না। যাঁহারা ভয়মুক্ত হইয়াছেন তাঁহারাই জগতে একমাত্র সুখী। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই সকল ভয় জয় করা যায় এবং তখন হৃদয়ে অনাবিল আনন্দের প্রবাহ বহিতে

থাকে।[২৬] শাশ্বত আনন্দ লাভের নামই অভয়। অথবা বৈরাগ্য বা নিষ্কামবোধ অভয়। সুতরাং যাহাতে এই জীবনেই আমরা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারি তাহার জন্য সম্যক্‌রূপে যত্নশীল হওয়া উচিত। আত্মজ্ঞানের আলোক আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করে ও সেই সম্বন্ধে অজ্ঞান জন্য ভয়, শোক, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু ও এমন কি পরাধীনতা, সর্বপ্রকার বন্ধনাদি ও মোহাদি হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া থাকে।

স্বার্থপরতাই অজ্ঞান বা অবিদ্যা এবং ইহা অজ্ঞান হইতেই প্রসূত। এই অজ্ঞানই আমাদের ঐশ্বরীক ভাব ও আত্মাকে আবরণীশক্তি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপশক্তি দ্বারা জড় দেহই যে আত্মা এই 'মিথ্যাজ্ঞান' সৃষ্টি করে।[২৭] এই অবিদ্যার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মস্বরূপ ভুলিয়া যাই এবং আমাদিগকে মরণশীল মানবের পুত্র বা কন্যা ইত্যাদি বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এই-প্রকারে আমরা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ি এবং 'আমি, আমার' ইত্যাকার স্বার্থপরতার পাশে আবদ্ধ হই। আত্মজ্ঞান অবিদ্যা নাশ করে তখন নিঃস্বার্থভাবের উদয় হয়। তিনিই ধন্য যাঁহার

২৬। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৯

২৭। "অজ্ঞানস্যাবরণবিক্ষেপনামকমস্তি শক্তিদ্বয়ম্। আবরণশক্তিস্তাবৎ * * অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নমসংসারিণম্ অবলোকয়িতৃবুদ্ধি পিধায়কতয়াচ্ছাদয়তীব। অনয়ৈবাবরণশক্ত্যাবচ্ছিন্নস্যাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখমোহাত্মকতুচ্ছসংসারভাবনাপি সংভাব্যতে যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসংভাবনা। বিক্ষেপশক্তিস্তু যথা রজ্জ্বজ্ঞাং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকমুদ্ভাবয়ত্যেবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি বিক্ষেপশক্ত্যাকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি।"—বেদান্তসার, ৫০-৫২

চিত্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের ভয় এবং স্বার্থপরতারূপ কৃষ্ণ-মেঘ-জাল মুক্ত হইয়া জ্ঞান-সূর্যের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

ভাবিয়া দেখ, এই জগৎ কি? ইহা অজ্ঞানপ্রসূত ও রহস্য-সমাচ্ছন্ন। আত্মজ্ঞান সর্বপ্রকার সাংসারিকভাব দূর করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে এবং ঈশ্বর যেরূপ ভয়শূন্য, আমা-দিগকেও সেইরূপ ভয়শূন্য করে। ঈশ্বর কি কোনও কিছুকে ভয় করেন? না, তাহা কিরূপেই বা সম্ভবপর হইতে পারে? যে মুহূর্তে আমাদের অনুভূতি হইবে যে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরে অবস্থান করিতেছেন সেই মুহূর্তেই আমাদের সমস্ত ভয় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। যখন আমরা জানিতে পারিব যে, মৃত্যু দেহের ভাবান্তর মাত্র, অর্থাৎ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ ভিন্ন মৃত্যু আর কিছুই নহে, এবং যখন ইহাও জানিব যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মা অপরিবর্তনশীল তখন আর আমাদের মৃত্যুভয় কি করিয়া থাকিবে? যাহাদের আত্মজ্ঞান লাভ হয় নাই তাহারা সত্যই দুর্ভাগ্য! যে পর্যন্ত না তাহারা তাহাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারে, সে পর্যন্ত তাহাদের এই অজ্ঞানের সংসারে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে।

আত্মজ্ঞানই অনন্ত সুখের একমাত্র কারণ। ইহাই আত্ম-স্বাধীনতা ও মোক্ষের পথে লইয়া যায়। আপনি মুক্তির অন্বেষণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ মৃত্যুভয়ের দাস হইয়া সাংসারিক অবস্থাগুলির অধীন থাকিবেন, ততক্ষণ আপনি উহা লাভ করিতে পারিবেন না। আপনি ঈশ্বরের অংশ—ইহা চিন্তা করুন, ধ্যান করুন, তাহা হইলেই সমস্ত বন্ধন রূপ অজ্ঞান ছিন্ন হইয়া যাইবে ও আপনি মুক্ত[২৮] হইবেন। আত্মজ্ঞানের

২৮। মুক্ত বা মুক্তি হওয়া যায় অজ্ঞান-রূপ মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলে।

দ্বারা এই প্রকার মোক্ষ লাভ হইলে তবেই আপনার 'অহং ব্রহ্ম' বা 'সোঽহং' ভাব এবং ঈশ্বরের সহিত একত্বানুভূতির উদয় হইবে। তখনই আপনি বলিতে সক্ষম হইবেন "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"[২৯] অর্থাৎ সূর্যের মধ্যে যে জ্যোতিঃ দেখিতেছি তাহা আমার মধ্যেও আছে এবং আমার মধ্যে যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত তাহাই সূর্যের মধ্যে দেদীপ্যমান। আমিই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রভু এবং জাগতিক বস্তুরও আমি প্রভু। তখনই আপনি বুঝিবেন যে, 'আমিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আলোক স্বরূপ। আমারই আলোকে শশী, সূর্য, নক্ষত্র ও বিদ্যুৎ প্রকাশমান। আমি আমার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি, নিখিল বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ কি তাহাও আমি উপলব্ধি করিয়াছি। সুতরাং আমি সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বিরাটপুরুষের সহিত এক এবং এই বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।'

২৯। ঈশোপনিষৎ ১৬

বাঙ্‌মে মনাস প্রতিষ্ঠিতা, মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতং আবিরাবির্ময়োঽভূর্ব্বেদসা মৎসাহ্ণীঋর্তং মা মা হিংসী-ধনেনাধীতেনাহোরাত্রাৎ সংবসাম্যগ্ন ইড়া নম ইড়া নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃদ্‌ভ্যো মন্ত্রপতিভ্যো নমো বোঽস্তু দেবেভ্যঃ শিবা নঃ শংতমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতী মা তে ব্যোম সাদৃশি। অদধ্বং মন ইষিরং চক্ষুঃ সূর্য্যো জ্যোতিষাং শ্রেষ্ঠো দীক্ষে মা মা হিংসীঃ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

—কৌষীতক্যুপনিষৎ।

হে বাগ্‌দেবি, আমার বাক্য ও মনে প্রতিষ্ঠিত হউন এবং মন বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হউন। তুমি মূর্তিমতী জ্ঞানস্বরূপিণীরূপে আবির্ভূতা। আমার নিকট হইতে তুমি শব্দরূপে দিগ্ব্যাপিনী হইয়াছ; অতএব সত্য নষ্ট করিও না। বর্তমান অধ্যয়নেই যেন দিন রাত্রি একই ভাবে অবস্থান করিতে পারি। হে অগ্নি, তোমাকে সর্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপ্রযোজক ঋষিগণকে সর্বতোভাবে নমস্কার। মন্ত্রপতি দেবগণ, তোমাদিগকেও নমস্কার। সরস্বতী আমাদিগের প্রতি বিশুদ্ধা কল্যাণময়ী এবং সুখদায়িণী হউন। আমি যেন শূন্যময় না দেখি। সূর্য যেরূপ জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কখনও ইহার অন্যথা হয় না সেইরূপ আমাদের মন নির্মল এবং চক্ষু ইষ্টদর্শী হউক। ইহার অন্যথা করিও না। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ প্রাণ ও আত্মা ॥

যীশুখ্রীষ্টের আবির্ভাবের অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক যুগের সময় হইতে ভারতবর্ষে আত্মজ্ঞানের চর্চা কেবল যে দার্শনিক পণ্ডিতগণের বা ঋষিদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে, তৎকালীন রাজন্যবর্গও আত্মজ্ঞান লাভকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া জানিতেন। প্রাচীন ভারতে অধিকাংশ ক্ষত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণ না হইয়াও আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার্যরূপে গণ্য ছিলেন। সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, পুরাকালে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন এবং রাজ্যশাসনাদি ও যুদ্ধাদি কার্য ক্ষত্রিয়গণেরই কর্তব্য ছিল; কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং সংগ্রামের সময় তাঁহারা যথেষ্ট শৌর্য, বীর্য ও সাহসেব পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই কখনও দেশের রাজা বা সম্রাট্ হইতেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রসিদ্ধ সেনাপতি হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইঁহারাই আবার তৎকালীন ক্ষত্রিয়গণকে ধনুর্বিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যাদি শিক্ষা দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে উপনিষৎ এবং পুবাণসমূহে বর্ণিত আছে যে, ক্ষত্রিয়গণই প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চতর আধ্যাত্মিক বিষয়ে ব্রাহ্মণগণের আচার্য বা উপদেষ্টা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র এবং বুদ্ধ ইঁহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধব্যবসায়ী

জাতি বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় তাঁহারা দেশ রক্ষা করিতে, রাজ্য-শাসন করিতে, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে এবং রাজ্যে শান্তি, সুবিচার ও ধর্ম্ম স্থাপন করিতে বাধ্য ছিলেন। যদিও এই সকল কার্য ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ছিল তথাপি তাঁহারা প্রকৃত শিক্ষাভিলাষী অনুসন্ধিৎসুগণকে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতেও অধিকারী ও সমর্থ ছিলেন।

প্রাচীনকালে হিন্দু শাসনকর্তাগণ আধুনিক রাজাদিগের মত ছিলেন না। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, মানব-জীবনের একটি গূঢ় তাৎপর্য আছে এবং যতদিন উহা উপলব্ধি করিতে না পারা যায় ততদিন জীবনের সার্থকতা পূর্ণ হয় না। এমন কি সেই প্রাচীন যুগেও সত্যানুসন্ধিৎসু নৃপতিগণ ভাবিতেন যে, যাহারা 'আমি কে', এবং 'আমার স্বরূপই বা কি,' —এই তত্ত্বসমূহের মীমাংসা না করিয়া জীবনযাপন করে তাহারা গভীর অন্ধকারেই পড়িয়া আছে। এই সমস্ত কারণে তাহারা ক্ষাত্রধর্ম-বিহিত রাজ্যশাসন প্রভৃতি কর্মাদি সম্পাদন করিয়াও আত্মজ্ঞান সাধনার জন্য যথেষ্ট অবসর পাইতেন।

পুরাকালে এই ভারতবর্ষে বারাণসী নগরীতে দিবোদাস নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বারাণসী তখন পাশ্চাত্য জগতের এথেন্স[১] নগরীর ন্যায় ভারতের সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষার স্থান ও ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে এই বারাণসী প্রাচ্য-সভ্যতার সৃষ্টিক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। যীশুখৃষ্টের জন্মগ্রহণের পাঁচশত বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের সময়ও এই স্থান হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের এবং ধর্মের প্রধানকেন্দ্র ও অনুশীলনক্ষেত্র ছিল। তথাগত বুদ্ধদেব যদি এই বারাণসীর পণ্ডিতগণকে

১। ইউরোপের অন্তর্গত গ্রীস্ দেশের রাজধানী ছিল।

বিচারে পরাজিত করিয়া নিজপক্ষ অবলম্বন করাইতে না পারিতেন তাহা হইলে সমগ্র ভারতে তিনি ধর্মপ্রচার ও নিজ মত স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন না।

বারাণসীরাজ দিবোদাসের প্রতর্দন নামে এক শৌর্যবীর্য-শালী পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার দুর্ধর্ষ শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি দেবতাগণকেও যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। রাজকুমার প্রতর্দন অসীম সাহস ও অলোকসামান্য শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত প্রবল নবপতিগণকে পরাজিত করিয়া দেবতাগণকে জয় করিবার মানসে পরিশেষে দেবলোকে উপস্থিত হইলেন। কৌষীতকী-উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই অভিযানেব বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের মতে বজ্রধারী ইন্দ্র বহু যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা এবং জ্ঞানার্জন করিয়া দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছিলেন। দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন অন্যান্য দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্রকে পরাভূত করিবার জন্য আবার ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। তিনি কিরূপে প্রবল শত্রুগণকে ধ্বংস করিয়া দেবতাদিগকেও পরাজিত করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট বর্ণনা করিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরপুরুষকে সমাগত দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় .হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য এবং কি প্রকাবেই বা সেই অতিথি সন্তুষ্ট হইবেন তাহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার অসীম ক্ষমতা ও বিজয়ের বার্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিলেনঃ "আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমি তোমাকে বর দিতে ইচ্ছা করি। তোমার যাহা অভিলাষ তাহা প্রার্থনা কর, আমি

তাহা পূরণ করিব।" রাজপুত্র প্রতর্দন উত্তর করিলেন: "হে দেবরাজ, যাহা লোকের সর্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর সেইরূপ বরই আপনি বিবেচনা করিয়া আমায় প্রদান করুন।" লোকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ইপ্সিত বস্তু কি তাহা প্রতর্দন জানিতেন না, কিন্তু ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে যাহার দ্বারা সকলেই কৃতকৃতার্থ হইতে পারে। যে সকল মায়াবদ্ধ ব্যক্তি আপনার স্বরূপ অবগত না হইয়া অজ্ঞানান্ধকারে বাস করিতেছে তাহাদের এইরূপ কিছু প্রয়োজন যাহা দ্বারা তাহারা তাহাদের জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতর্দন পুনরায় বলিলেন: "মনুষ্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া আপনি মনে করেন তাহাই আমায় দান করুন।" দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর করিলেন: "উহা ঠিক নহে, তুমি তোমার অভিপ্রেত বর নিজে প্রার্থনা কর। নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে অপরে তাহার হইয়া কি প্রকারে মনোনীত করিয়া দিবে?" রাজপুত্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন: "আমি আপনার নিকট আমার নিজের জন্য বর প্রার্থনা করিতে চাহি না।" মনুষ্যের পক্ষে কি শ্রেয়স্কর বস্তু হইতে পারে তাহার ধারণা না থাকায় প্রতর্দন নির্দিষ্ট কোন বরই প্রার্থনা করিতে পারিলেন না; সুতরাং তিনি সমস্ত ভার ইন্দ্রের উপর অর্পণ করিলেন। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন: "আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ এবং আমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ হইবে না; সেইজন্য আমি তোমাকে এইরূপ বর প্রদান করিব যাহা অপেক্ষা মনুষ্যজাতির আর অন্য কোনও শুভকর ও আবশ্যকীয় বস্তু হইতে পারে না।"[২]

২। "সহোবাচ মামেব বিজানীহ্যেতদেবাহংমনুষ্যায় হিততমং মন্যে।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।১

ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিলেন: "আমাকে জান। আমার স্বরূপকে বিদিত হওয়াই মানবের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর —ইহা আমি মনে করি।"

দেবরাজ ইন্দ্র যে বলিলেন: "আমাকে বিদিত হও।" ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, 'আমার (ইন্দ্রের) শক্তি ও আমার যশকে বিদিত হও।' ইহার তাৎপর্য এই যে, 'আমি, আমাকে, আমার' বা 'তুমি, তোমাকে, তোমার' এই শব্দগুলির দ্বারা যাহাকে নির্দেশ করা হয় তাহারই যথার্থ স্বরূপ সেই আত্মাকে বিদিত হও। যিনি এই স্বরূপকে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি অসীম দিব্যশক্তি লাভ করিবেন। এই অবস্থায় তিনি যদি কায়িক কোনও অন্যায় কার্য করেন তাহা হইলে পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। যে ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারিয়াছেন তিনি সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী; সামান্য রাজা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটও তাঁহার নিকট কিছুই নহে। তিনি শাস্ত্রে উল্লিখিত সর্বপ্রকার সদ্‌গুণের অধিকারী হন এবং কিছুতেই তাঁহার আত্মজ্ঞানলব্ধ মহিমা ম্লান হয় না।

পবে ইন্দ্র পুনরায় বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের মহিমা বর্ণনা করিবাব জন্য বলিলেন: "আমি সমস্ত দৈত্যগণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছি, আমি ত্রিশীর্ষ দৈত্যকে ও ত্বষ্ট্রৃতনয় বিশ্বরূপকে নিহত করিয়াছি, যে সকল যতি মুখে বেদোচ্চারণ করে না তাহাদিগকে বন্য কুক্কুবেব মুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, স্বর্গে প্রহ্লাদের অনুবর্তী অসুরদিগকে, ভুবর্লোকে (পাতালে) পুলোমবংশীয় অসুরগণকে এবং পৃথিবীতে কালখঞ্জের অধীন অসুরদের বিনাশ করিয়াছি। আমি এইরূপ অনেক নিষ্ঠুর কর্ম করিয়াছি কিন্তু আমার আত্মজ্ঞান আছে বলিয়া এই সমস্ত নৃশংস কার্য করিলেও আমার যশ, শক্তি ও প্রভাবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই; এমন কি

আমার একটি কেশেরও কোনও ক্ষতি হয় নাই। যে ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ জানেন, তিনি জীবনে যত পাপকার্যই করুন না কেন—এমন কি চৌর্য, পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা অথবা বেদপাঠনিরত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে হত্যা প্রভৃতি পাপকর্ম দ্বারাও তাঁহার সুকৃতের ফল বিনষ্ট হয় না ; সেই ব্যক্তি কোন পাপকার্য করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহার মুখকান্তি কখনও ম্লান হয় না।"[৩] এইরূপে ইন্দ্র আত্মজ্ঞানের কি মহিমা তাহা প্রতর্দনকে বর্ণনা করিলেন।

ইহা সত্য যে, এই প্রকার বর্ণনার দ্বারা ইন্দ্র ইহা বুঝাইতে চাহেন নাই যে, আত্মজ্ঞানে বলীয়ান্ হইয়া সাধকেরা এইরূপ নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক নানাবিধ পাপকর্ম করিবেন, অথচ তাহাদের কোন পাপ হইবে না। কিন্তু ঐ প্রকার বর্ণনার দ্বারা দেবরাজ ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানের শক্তি পৃথিবীর যাবতীয় অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কারণ আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মহাপাপীরও হৃদয়কে নির্মল করে এবং মনুষ্যের অতি ভয়ানক মহাপাপও ইহা দ্বারা ধৌত হইয়া যায়। পিতা-মাতার হত্যাকারীর বা গুরু হত্যাকারীর পাপ যাহা কখনই ক্ষমার যোগ্য বলিয়া মনে হয় না, তাহাও আত্মজ্ঞানলব্ধ ও চিত্তশুদ্ধকারী পবিত্র শক্তিকে মলিন করিতে পারে না।

দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া প্রতর্দনকে পুনরায় বলিলেন : "আমিই জীবনীশক্তি প্রাণ এবং আমিই প্রজ্ঞাত্মা। আমাকে আয়ু অর্থাৎ প্রাণীগণের জীবনের কারণ এবং অমৃতস্বরূপ জানিয়া আমার উপাসনা কর। আয়ুই

৩। "স যো মাং বিজানীয়ান্নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে।
ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য
পাপং চ ন চকৃষো মুখান্নীলং বেত্তীতি।"
—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।১

প্রাণ এবং প্রাণই আয়ু এবং প্রাণই অমৃত।"[৪] সংস্কৃত ভাষায় জীবনীশক্তিকে 'প্রাণ' বলে। প্রাণ এবং চৈতন্য অভিন্ন। যেখানেই প্রাণ আছে সেখানেই চৈতন্য কোন-না-কোন আকারে থাকিবেই। ইন্দ্র সেইজন্য আবার বলিলেন: "প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে আমারই রূপ মনে করিয়া ধ্যান কর। জীবনই প্রাণ এবং প্রাণই জীবন। জীবন অমরত্ব এবং অমরত্বই জীবন।" এই স্থলে আমাদের বুঝিতে হইবে যে, জীবন বা প্রাণের কখনও মৃত্যু নাই। প্রাণ শাশ্বত ও অবিনাশী, ইহার কোনও পরিবর্তন হইতে পারে না। প্রাণকে আমরা সমষ্টি প্রাণ হইতে বর্ধিত বা পরিবর্তিত হইতে দেখি না।

বাহ্যজগতে স্থূলভাবে প্রকাশমান হউক অথবা না হউক, প্রাণ সূক্ষ্মভাবে সর্বসময়ে একই প্রকার থাকে। ইহার স্থূল-বিকাশ বিচিত্র প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু জীবনীশক্তি বলিতে যাহা বুঝিতে পারা যায় তাহা অপরিবর্তনীয় এবং সর্বদা একই ভাবে থাকে। স্থূলদেহে জীবনীশক্তি বিকাশের অভাবকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি; কিন্তু বাস্তবিক প্রাণ বা জীবনী-শক্তির যে মৃত্যু নাই ইহা অল্পসংখ্যক লোকই ধারণা করিতে পারেন। যেখানে প্রাণ আছে সেখানে মৃত্যু থাকিতে পারে না। আমরা বলিয়া থাকি যে, একটি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং সে দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ঐ শিশুটির প্রাণ বা জীবনীশক্তি কি বর্ধিত হয়? যদি জীবনী-শক্তি বা প্রাণ জন্ম ও বৃদ্ধির অধীন হইত তাহা হইলে উহা পরিবর্তনশীল ও নশ্বর হইত। যাহাকে আমরা জীবনীশক্তি

৪। "সহোবাচ প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা; তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব। আয়ুঃ প্রাণঃ। প্রাণো বা আয়ুঃ। প্রাণ উবাচামৃতম্।"
—কৌষীতকু,পনিষৎ ৩।২

বা প্রাণ বলিয়া থাকি তাহার জন্ম ও বৃদ্ধি, ক্ষয় ও মৃত্যু কোন দিনই হইতে পারে না। আমরা শুধু স্থূল আকারেরই পরিবর্তন হইতে দেখি, কিন্তু ঐ সমস্ত পরিবর্তনের সহিত অবিনাশী প্রাণ বা জীবনীশক্তির কোনই হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। জীবনীশক্তির বিকাশ যে সমস্ত আধারের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে সেই আধারগুলিরই কেবল হ্রাসবৃদ্ধিরূপ পরিবর্তন হইয়া থাকে। যেমন আমরা বলি যে, একটি শিশু বা একটি চারাগাছ ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতেছে। এক্ষণে দেখা যায়, যাহা কিছু পরিবর্তিত হইতেছে তাহা উহাদের কেবল স্থূল আকারের মধ্যেই ঘটিতেছে, উহাদের যে জীবনীশক্তি বা প্রাণ তাহা সদাসর্বদা কিন্তু সমভাবেই বর্তমান আছে। প্রাণ অন্যান্য ভৌতিক শক্তির বিকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় প্রাণীজগতের বা উদ্ভিদ-জগতের ক্রমবিকাশ বা ক্রমবর্ধনের বিচিত্র অবস্থার ভিতর দিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে মাত্র।

"যাহা 'প্রাণ' তাহাই 'জীবন' এবং যাহা 'জীবন' তাহাই 'অমরত্ব'। যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রাণ আছে ততক্ষণ উহার জীবনও আছে। এই প্রাণের সাহায্যেই স্বর্গাদি লোকে গতি হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারা যায় বলিয়া প্রাণই 'অমৃত'।[৫]

যদি আমরা প্রাণের যথার্থ স্বরূপকে জানিতে পারি এবং যদি প্রাণের সহিত জীবন অবিচ্ছিন্নরূপে সংশ্লিষ্ট এই ভাবটিও অনুভব করিতে পারি তাহা হইলে আমাদের যে মৃত্যু নাই, আমরা অবিনাশী ইহা নিশ্চয়ই অনুভূত হইবে। কারণ, প্রাণ বা জীবনের মৃত্যু হইতে পারে না এবং প্রাণহীন কোন জড়

৫। যাবৎ হি অস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুঃ। প্রাণেন হেবামুস্মিল্লোঁকেঽমৃতত্বমাপ্নোতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

পদার্থ হইতে প্রাণ কখনও উৎপন্ন হয় নাই। যদি আমরা আমাদের প্রাণের উৎপত্তি কোথায় তাহা কল্পনা করিতেও চেষ্টা করি তাহা হইলে প্রাণ কোনও প্রাণহীন অচেতন পদার্থ বা মৃত পদার্থ হইতে আসিয়াছে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কখনও পারিব না। যদি প্রাণের উৎপত্তিই স্বীকার করিতে হয় তবে বলিতে হইবে যে, প্রাণ উৎপন্ন হয় প্রাণ হইতেই। এই প্রাণ সেই অনাদিকাল হইতেই আছে এবং ইহার যে কোনও মৃত্যু বা ধ্বংস হইতে পারে তাহা আমরা ধারণা কিম্বা কল্পনাই করিতে পারি না; সুতরাং প্রাণ নিত্য পদার্থ। এই প্রাণ যখনই কোন স্থূলদেহের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয় তখনই দেহটিকে জীবিত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাকেই প্রাণশক্তির গৌণ বিকাশ বলিতে হয়। এখানে আমরা জীবনীশক্তির বা প্রাণেব বিষয় ভাবি না, কিন্তু প্রাণেব সাহায্যে যে দেহটি গতিশীল ও কার্য্যক্ষম তাহাবই বিষয় ভাবিয়া থাকি। যদি আমবা দেখি যে, কোনও একটি জীব বা প্রাণী কার্য করিতেছে তখন আমরা কারণরূপী প্রাণশক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া উক্ত জীব বা প্রাণীর কথাই মাত্র মনে করিয়া থাকি; যেমন বলি 'অমুক ব্যক্তি এতদিন জীবিত ছিলেন বা অমুক ব্যক্তি ষাট অথবা আশী বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন'। এই সমস্ত উক্তির দ্বাবা আমরা আয়ু বা প্রাণের গৌণ বিকাশমাত্রেরই বাস্তবিক উল্লেখ কবিয়া থাকি; মুখ্যভাবে কিন্তু প্রাণ সমস্ত গতিব অতীত ও অমর অর্থাৎ মৃত্যুহীন। যখন কোন শরীবে এই প্রাণেব বা জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি হয় তখনই শরীবেব অংশগুলি ক্রিয়াশীল হয়, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয় সকল নিজ নিজ কার্য করে, মন চিন্তা করে এবং বুদ্ধিও কার্যকরী হয়।

আবার এই প্রাণ প্রজ্ঞা হইতে অভিন্ন বা অবিচ্ছেদ্য। যে

শক্তি এই বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তুকে গতিশীল করে সেই শক্তিকে আমরা 'প্রজ্ঞা' হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। আত্মার মধ্যে দুইপ্রকার শক্তি নিহিত আছে, একটি চিৎ-শক্তি বা প্রজ্ঞারূপে প্রকাশ পায় এবং অপরটি জীবনীশক্তি বা প্রাণের ক্রিয়ারূপে প্রকাশ পায়। যাহা দ্বারা কোনও বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাই 'প্রজ্ঞা'। ইহা চৈতন্যস্বরূপ। ইহাকে 'বিষয়জ্ঞান' বলা যাইতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির জ্ঞান কেবল বুদ্ধির ক্রিয়া মাত্র; কিন্তু এই ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান যাহা দ্বারা উদ্ভূত হয় তাহাকেই 'প্রজ্ঞা' বলে। "প্রজ্ঞয়া সত্যং সঙ্কল্পং," এই প্রজ্ঞা বা জ্ঞানশক্তি দ্বারাই অভিলষিত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতে লাগিলেন: "যে ব্যক্তি আমাকে অবিনশ্বর, ধ্বংসাতীত এবং অপরিবর্তনশীল প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপে জানে সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল এই পৃথিবীতে বাস করিয়া মৃত্যুর পরে স্বর্গধামে গমন করে এবং সেখানে অনন্ত ও শাশ্বত জীবন উপভোগ করে।"[৬] এখানে ইন্দ্র জীবনীশক্তির পরিবর্তে 'প্রাণ' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া রাজপুত্র প্রতর্দন ভাবিলেন ইন্দ্র বোধ হয় ইন্দ্রিয়শক্তি অর্থাৎ 'প্রাণ' শব্দটি উল্লেখ করিতেছেন; কারণ 'প্রাণ' শব্দটি দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, মল-মূত্রাদি শক্তি, প্রজননশক্তি, আস্বাদন শক্তি, স্পর্শশক্তি, ধারণাশক্তি এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় শক্তি বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইজন্য ইন্দ্র বলিলেন: "কেহ কেহ বলেন যে, সমস্ত প্রাণ বা ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি একীভূত হইয়া

৬। "স যো মাং আয়ুরমৃতমিত্যুপাস্তে সর্বমায়ুরস্মিল্লোঁক এবাপ্নোত্যমৃতত্বমক্ষিতিং স্বর্গে লোকে।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

যায়, কারণ তাহা না হইলে একই সময়ে কেহ দর্শন, শ্রবণ, বাক্য উচ্চারণ এবং চিন্তাও করিতে পারিবে না। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি এক হইয়া পরে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় পৃথক্‌ভাবে তাহার শক্তির পরিচয় দেয়।"[৭] বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির কার্যাবলীকে ইন্দ্র প্রাণের কার্য বলিতেছেন মনে করিয়া রাজপুত্র জানিতে চাহিলেন যে, তিনি কোন্‌ ইন্দ্রিয়ের কার্যকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহাকে উপরি উক্ত উপদেশ দিয়াছেন। অবশ্য জীবনীশক্তি বা প্রাণ যে একই তাহা রাজপুত্র সম্পূর্ণ অনুমোদন করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার ধারণা ছিল যে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ যুগপৎ কার্য না করিয়া পৃথক্‌ভাবে একটির পর একটি করিয়া তাহাদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।[৮]

বাস্তবিক, দুইটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি কখনও একই সময়ে হয় না, ঐ দুইটি অনুভূতির অন্তরালে সামান্য অবকাশ থাকিবেই থাকিবে। কখনও কখনও আমাদের মনে হয় যে, একই সময়ে একটি শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হইল ও একটি দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইল, কিন্তু বস্তুতঃ ঐ দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্য একই সময়ে সম্পন্ন হয় নাই এবং ইহার সত্যতাও যথাযথ বিশ্লেষণ বা বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি কখনও একই সময়ে

৭। "তদ্ধৈক আহুরেকভূয়ং বৈ প্রাণা গচ্ছন্তীতি। ন হি কশ্চন শক্নুয়াৎ সকৃদ্বাচা নাম প্রজ্ঞাপয়িতুং চক্ষুষা রূপং শ্রোত্রেণ শব্দং মনসা ধ্যানমিত্যেকভূয়ং বৈ প্রাণা।—"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

৮। "একৈকং সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞাপয়ন্তি বাচং বদন্তীং সর্বে প্রাণা অনুবদন্তি। চক্ষুঃ পশ্যৎ সর্বে প্রাণা অনুপশ্যন্তি; শ্রোত্রং শৃণ্বৎ সর্বে প্রাণা অনুশৃণ্বন্তি; মনো ধ্যায়ৎ সর্বে প্রাণা অনুধ্যায়ন্তি। প্রাণং প্রাণন্তং স.ব প্রাণা অনুপ্রাণন্তীতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

এবং একই সঙ্গে হইতে পারে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমতে মন ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি-যোগ্য বস্তুসকলকে একটির পর একটি করিয়া গ্রহণ করে, অর্থাৎ মন একটি বস্তুতে যুক্ত হইবার পরে তবে অপর একটি বস্তুতে যুক্ত হয়। যখন একটি ইন্দ্রিয় তাহার কার্যে রত হয় তখন অপর ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট বা শান্তভাবে তাহাকে অনুমোদন করে। দুইটি ইন্দ্রিয়ের কার্যের মধ্যে ক্রমবিচ্ছেদ বা অবকাশ এত অল্প যে, যদিও আমরা মনোযোগ করিয়াও উহার বিষয় অবগত হইতে না পারি তথাপি ইহা সত্য যে, ইন্দ্রিয়গুলি একটীর পর একটি করিয়া পৃথক্‌ভাবে তাহাদের কার্য করিয়া যাইতেছে। এই সমস্ত কারণে রাজপুত্র প্রতর্দন বুঝিতে পারেন নাই যে, দেবরাজ ইন্দ্র প্রাণকে উদ্দেশ্য করিয়া কোন্ ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করিতেছিলেন। সুতরাং ঐ জটিল প্রশ্নটি করিয়া তিনি নীরবে উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

তাহার পর ইন্দ্র বলিলেন: "ইহা সত্য বটে যে, ইন্দ্রিয়-গুলি পর্যায়ক্রমে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্যগুলি সম্পাদন করে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই শক্তিশালী; কিন্তু ইহাও জানিও যে, এই ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ ব্যতীত আর একটি জীবনীশক্তি আছে যাহার তুলনায় অন্য যে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়শক্তিই তুচ্ছ; অর্থাৎ সকলপ্রকার শক্তি অপেক্ষা ঐ জীবনীশক্তিই শ্রেষ্ঠ।"[৯]

৯। "এবমুহৈবৈতদিতি হেন্দ্র উবাচ, অস্তীত্যেব প্রাণানাং নিঃশ্রেয়সাদানমিতি। জীবতি বাগপেতো, মূকান্বিপশ্যামো জীবতি চক্ষুরপেতোঽন্ধান্বিপশ্যামো জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্বিপশ্যামঃ।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

যে শক্তি আমাদের দর্শন করায় বা শ্রবণ করায় সেই শক্তি কিন্তু আমাদের জীবন ধারণ করিতে সাহায্য করে না। যেমন অন্ধ দেখিতে পায় না অথবা বধির শুনিতে পায় না, কিন্তু তথাপি তাহাদের জীবিত থাকিতে দেখা যায়। মূক (বোবা) ব্যক্তির মধ্যে বাক্‌শক্তি থাকে না কিন্তু সেই মূকও আবার বাঁচিয়া থাকে। এইরূপ যে সকল ব্যক্তির ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি বা স্পর্শশক্তি নষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। শিশু এবং জন্মমূঢ় ব্যক্তিগণের চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না, কিন্তু তাহারা বাঁচিয়া থাকে।[১০] আবার ইহাও দেখা যায় যে, স্মৃতিশক্তির লোপ হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিও জীবিত থাকে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যে শক্তিদ্বারা আমরা জীবিত থাকি সেই শক্তি এবং দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, বাক্‌ ও চিন্তাশক্তি ঠিক এক নহে। আবার কোনও ব্যক্তি হস্তবিহীন হইয়া কিছু ধরিতে সক্ষম না হইলেও আমরা তাহাকে 'মৃত' নামে অভিহিত করিতে পারি না। এইরূপ যদি কাহারও পদ বা অন্য কোনও অঙ্গ বিকল হয় তাহা হইলে বিকলাঙ্গ হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তির জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' তিরোহিত হইবে না। সুতরাং এখন আমরা বলিতে পারি যে, এই জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' ইন্দ্রিয়ের কার্য অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। আবার ইহাও সত্য যে, জীবনীশক্তি বিচ্যুত হইলে দেহের বর্হির্যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও কোন কার্য করিতে পারে না—অচল হইয়া যায়।

১০। "জীবতি শ্রোত্রাপেতো বধিরান্হিপশ্যামো ;
জীবতি বাহুচ্ছিন্নো জীবতি উরুচ্ছিন্নো ইতি।
এবং হ্যহ পশ্যাম ইতি।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।২

জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' ইন্দ্রিয়শক্তির উপর নির্ভরশীল নহে ; কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি জীবনীশক্তির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যেখানে জীবনীশক্তির বহির্বিকাশ না থাকে সেখানে ইন্দ্রিয়গুলি নিখুঁৎ থাকিলেও উহাদের ক্রিয়াসমূহ এবং দর্শন ও শ্রবণাদি অনুভূতির কোনও অভিব্যক্তি দেখা যাইবে না। একটি মৃত ব্যক্তির চক্ষু অবিকৃত থাকিতে পারে, চক্ষুর সমস্ত স্নায়ুও ঠিক্ থাকিতে পারে, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র কোষগুলিও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে কিন্তু ঐ মৃত ব্যক্তির দেহের মধ্যে জীবনীশক্তি বিলুপ্ত থাকায় ইন্দ্রিয়গুলি নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিতে অক্ষম হয় এবং কোন প্রকার অনুভূতি উৎপন্ন করিতেও পারে না, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয় একেবারে প্রাণহীন অবস্থাতেই থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, সমস্ত ক্রিয়ার মূল এই 'মুখ্যপ্রাণ' ইন্দ্রিয়গুলিতে বিদ্যমান থাকিলেই তবে উহারা ক্রিয়াশীল হয়। কারণ 'মুখ্যপ্রাণ'ই ইন্দ্রিয়গুলির অধিপতি ও নিয়ামক। বেদেও দেখা যায় : "নিখিল বিশ্বের জীবনদাতা সেই জীবনী-শক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ'-কে সকলেরই উপাসনা করা উচিত।" যদি কেহ জীবনীশক্তি বা 'মুখ্যপ্রাণ' কি তাহা বুঝিতে পারেন তাহা হইলে তিনি কি উপায়ে জীবিত আছেন বা এই বিশ্বজগৎ কিরূপে সজীব আছে সেই রহস্যও তিনি ভেদ করিতে পারেন।

পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিকগণ, শরীরতত্ত্ববিদ্গণ এবং ক্রমবিকাশবাদিগণ সকলেই এই জীবনীশক্তিটি কিরূপ তাহা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা কি এই বিষয়ে কৃতকার্য হইয়াছেন ? না, তাঁহারা এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে সফলকাম হন নাই। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে,

ইহা আণবিক আকর্ষণশক্তি ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ভৌতিক ও রাসায়নিক শক্তির সংমিশ্রণের ফল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহাদের মধ্যে কি কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, তাঁহার মতটিই অভ্রান্ত সত্য ? জীবনীশক্তির মূল কোথায় এই বিষয় অন্বেষণ করিতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ? জীবনীশক্তি প্রকৃতিরাজ্যের জড়শক্তিসমূহ হইতে স্বতন্ত্র এই ধারণা পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া জীবনীশক্তির বা প্রাণের অনাদি উৎস কোথায় তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয় লইয়া বহু বাদ-প্রতিবাদ এবং গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু উহা পূর্বে যেমন জটিল ছিল এখনও উহাদের নিকট ঠিক্ সেই প্রকারই জটিল রহিয়া গিয়াছে, উঁহারা এ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তেও উপনীত হইতে পারেন নাই। যে মুহূর্তে আমরা এই সমগ্র বিশ্বের জীবনীশক্তি কি তাহা ধারণা করিতে পারিব সেই মুহূর্তে সেই চৈতন্যময় ঈশ্বরেরও ধারণা আমাদের হইবে। কারণ বেদান্ত বলে যে, যিনি ঈশ্বররূপে পূজিত, তাঁহার বিরাট সত্তা হইতে এই জীবনীশক্তি বা 'প্রাণ' অভিন্ন।

এক্ষণে প্রশ্ন, ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি ? যিনি সমস্ত বস্তুকে সচেতন রাখেন এবং যাঁহার উপর সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যাবতীয় ক্রিয়া ও দেহধর্মাদি নির্ভর করে তিনিই ঈশ্বর। দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন : "এই দেহ প্রাণের দ্বারা সজীব হওয়াতেই ক্রিয়াশীল হয়। এই প্রাণই সেই চেতনাসংযুক্ত 'অহং'। যাহা 'প্রাণ' তাহাই 'প্রজ্ঞা' এবং যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ ; এই দুইটিই দেহের মধ্যে এক সঙ্গে থাকে এবং এক সঙ্গে

চলিয়া যায়।"[১১] যেখানে জীবন নাই সেখানে কি কেহ 'প্রজ্ঞা'-র সন্ধান পাইয়াছে? উহা একেবারে অসম্ভব। যেখানে প্রজ্ঞা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই জীবন আছে। জীবন বা প্রাণ এবং প্রজ্ঞা এই দুইটিই অবিচ্ছেদ্য।

এক্ষণে বলিতে পারা যায় যে, বৃক্ষ-লতাদিতে প্রজ্ঞার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতে দেখা যায় না, সুতরাং তাহাদের প্রজ্ঞা নাই। কিন্তু এই সামান্য যুক্তির দ্বারাই কি উহাদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' নাই তাহা স্বীকার করা সঙ্গত হইবে? মনুষ্যের ন্যায় বৃক্ষাদির মস্তিষ্ক নাই বলিয়াই কি উহাদের মধ্যে 'প্রজ্ঞা' নাই এই মত পোষণ করিতে হইবে? বাস্তবিক মস্তিষ্কযুক্ত প্রাণীদের যেরূপ প্রজ্ঞা আছে, উদ্ভিদেরও ঠিক সেইরূপ প্রজ্ঞা না থাকিতে পারে, কিন্তু মস্তিষ্কের পরিবর্তে বৃক্ষাদির মধ্যে 'প্রাণ' ও তদুপযুক্ত স্নায়ু আছে এবং তাহার জন্যই তাহাদের 'প্রজ্ঞা' বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। যে সকল উদ্ভিদ্ স্পর্শমাত্রেই

১১। "অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি। তস্মাদেতদেবোক্থমুপাসীত। যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

অর্থাৎ যেহেতু প্রজ্ঞাস্বরূপ প্রাণই এই প্রত্যক্ষ শরীরকে 'ইহাই আমি' অথবা 'ইহা আমার' এইরূপ জ্ঞান করিয়া আসন ও শয্যাদি হইতে উত্থাপিত করান সেইজন্য তাঁহাকেই "উক্থ" (উত্থাপয়িতা) বলিয়া উপাসনা করা কর্তব্য। যিনি প্রাণ তিনিই প্রজ্ঞা; যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মা।

"স হ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতস্তস্যৈষৈব দৃষ্টিঃ।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

এই প্রজ্ঞা ও প্রাণ সম্মিলিত হইয়া এই শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়াই শরীর হইতে নির্গত হন, এই প্রাণোপাধিযুক্ত পরমাত্মাকে (হিরণ্যগর্ভকে) এইরূপেই অবগত হইতে হয়।

আকুঞ্চিত হয়, যেমন লজ্জাবতী লতা—তাহাদের যে অনুভব শক্তি নাই তাহা কেমন করিয়া বলা যায়?[১২] ঈশ্বর যে তাঁহার মহিমা প্রচারের জন্য কেবল মনুষ্যকেই জীবন দান করিয়াছেন, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের এবম্প্রকার গোঁড়ামীপূর্ণ বাক্যসমূহ অধুনা আর আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে না। এমন কি, আর্ণেষ্ট হেকেলের ন্যায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও সম্যকরূপে এই ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক লতাগুল্মের মধ্যেই আত্মা আছে এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবকোষের মধ্যেই প্রাণ আছে। প্রত্যেক কোষই সজীব; এমনকি প্রত্যেকটি পরমাণুর ভিতরও আত্মা আছে। আবার যেখানে আত্মা আছে সেখানে অহং জ্ঞানের মূলস্বরূপ 'প্রজ্ঞারূপ' চৈতন্যও আছে। তবে কোনও ক্ষেত্রে এই প্রজ্ঞার প্রকাশ অল্পমাত্রায় থাকে ও কোনও স্থলে বা ইহা সূক্ষ্মভাবে থাকে এবং কোথাও বা ইহা সুপ্তভাবে থাকিয়া বহিঃ-প্রকাশের উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু যাহাই হউক না কেন, ইহা নিশ্চিত যে, যেখানেই জীবন আছে সেখানেই চৈতন্যের বা প্রজ্ঞার কোন-না-কোন প্রকার অস্তিত্ব আছেই এবং যেখানেই প্রজ্ঞার প্রকাশ দেখা যায় সেইখানে প্রাণও আছে ইহা বুঝিতে হইবে।

আমরা প্রাণীজগতে দেখিয়া থাকি যে, 'প্রাণ' যখন শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায় তখন প্রজ্ঞাও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়। এইরূপ যখন কেহ নির্জীব অবস্থায় অর্থাৎ মূর্চ্ছাবস্থায় অথবা

১২। স্বর্গীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় *Response in Living and Non-living* নামক পুস্তকে বহু গবেষণা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃক্ষ ও লতা সমূহের, এমনকি জড় বলিয়া যে সমস্ত পদার্থকে আমরা অভিহিত করি তাহাদেরও প্রাণ, সংজ্ঞা ও অনুভূতি আছে; প্রাণহীন বস্তু বলিয়া জগতে এমন কোন পদার্থই নাই।

অচৈতন্যাবস্থায় থাকে তখন তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে জীবনীশক্তির কোনওপ্রকার বহিঃপ্রকাশের চিহ্ন থাকে না। এই সময়ে তাহার জ্ঞান বা প্রজ্ঞাও অন্তর্হিত না হইয়া সুপ্তভাবে থাকে ।

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র প্রতর্দনকে আবার বলিলেন ঃ "যখন কেহ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকে ও কোনও প্রকার স্বপ্নাদি দর্শন না দেখে তখন তাহার মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে ও সেই সময়ে ঐ ব্যক্তি অজ্ঞানরূপ আবরণের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে।"[১৩] কখন কখনও আপনারা দেখিয়াছেন যে, স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রা অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া মনে হয়, যেন আমরা এক অজ্ঞানের রাজত্ব হইতে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু এইরূপ নিদ্রাবস্থায় আপনাদের ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়াসমূহেরও দর্শন, শ্রবণ ও আঘ্রাণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের শক্তির কি অবস্থা হয় তাহা কি আপনারা জানেন ? তাহারা তখন প্রাণের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে, অর্থাৎ তাহারা চেতন স্তর হইতে ফিরিয়া যাইয়া জীবনীশক্তির (প্রাণের) মধ্যে তখন আশ্রয় লয়।[১৪]

যখন জীবনীশক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে তখন অন্যান্য শক্তিগুলিও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। গভীর নিদ্রাবস্থায় বা সুষুপ্তিতে আমরা

১৩। "এতদ্বিজ্ঞানম্ যত্রৈতৎ পুরুষঃ সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।"—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

অর্থাৎ সে অবস্থায় পুরুষ গাঢ়নিদ্রায় সুপ্ত হইয়া অন্য বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হন এবং কোন স্বপ্ন দর্শন করেন না। তখন সেই পুরুষের যাবতীয় শক্তি এই প্রাণেই একত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ইহাই প্রাণবিজ্ঞান।

১৪। "তদৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈঃ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

কথাও বলি না, দর্শনও করি না বা কোনও কিছুর আঘ্রাণও পাই না। যদি আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতি নিকটে কামানের শব্দ হয় তাহাও আমরা তখন শুনিতে পাই না। আমাদের মন তখন বাস্তবিক কোন বাহ্য বিষয়ের চিন্তা বা কল্পনা করে না। সমস্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিসমূহ তখন সুপ্তাবস্থায় থাকে ও আমরা জীবিত হইলেই উহারা যেন সেই সঙ্গে আবার বাহির হইয়া আসে। নিদ্রিতাবস্থা হইতে জাগরণের প্রথম লক্ষণ দৈহিক ক্রিয়ার দ্বারা পরিলক্ষিত হয়। স্বপ্নশূন্য নিদ্রাবস্থা বা সুষুপ্তি-অবস্থায় জীবনীশক্তি দেহের কেন্দ্রস্থান হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয় না, কারণ সেই সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, রক্ত-সঞ্চালন, পরিপাককরণ, পাকস্থলীর ক্রিয়া ও শ্বাস-প্রশ্বাসাদির ব্যাপারে বুঝিতে পারা যায় যে, মনের অবচেতন-স্তরে প্রাণশক্তি আমাদের অচেতন অবস্থাতেও এই সমস্ত কার্য করিয়া থাকে। যে শক্তির দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্র ও ফুসফুসের ক্রিয়া চলিতে থাকে সেই প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইলে শরীরের আর কোন ক্রিয়াই থাকে না। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হইলে কেহই আর জাগ্রত অবস্থায় ফিরিয়া আসে না। ইহাকেই মৃত্যু বলে। কিন্তু গভীর নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আমরা প্রাণের সহিত এক হইয়া যাই। তখন ও 'প্রাণ' আমাদের সচেতন দৈহিক ক্রিয়াসমূহকে অকর্ষণ করিয়া লয়, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় পুনরায় ঐগুলি নিজ নিজ ইন্দ্রিয়ে ফিরিয়া আসে। তখনই ইন্দ্রিয়গুলি আবার সচেতন হয় ও আপনার কার্য করিতে আরম্ভ করে।

এই ব্যাপার বা তথ্যটি ভালভাবে বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন: "যখন প্রাণোপাধিক পুরুষ সুষুপ্ত অবস্থা হইতে ফিরিয়া জাগ্রত

অবস্থায় উপনীত হন তখন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসমূহ চতুর্দিকে নির্গত হয় সেইরূপ এই প্রাণোপাধিক আত্মা হইতে বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গের মত নির্গত হইয়া নিজ নিজ স্থানে উপস্থিত হয় এবং পরে বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে আসে।"[১৫] যখন এইরূপ একটি প্রাণের প্রেরণা বা স্পন্দন চক্ষুকে আশ্রয় করে তখন উহা দৃশ্য বস্তুটিকে, তাহার আকারকে ও বর্ণকে উদ্ভাসিত করে। এইরূপে অপর একটি প্রাণস্পন্দন শ্রবণেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিলে শব্দের শ্রবণ হয়। ঠিক একই প্রকারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তিসকল প্রাণরূপ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণারূপে নির্গত হইয়া আপনাপন ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাইতে থাকে। মনও এইরূপ একটি প্রাণেরই স্পন্দন মাত্র এবং উহার দ্বারাই মনের চিন্তা প্রভৃতি নানাবিধ মানসিক কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কেহ রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি বশীভূত হইয়া দুর্বলতাবশতঃ হস্তপদাদি অত্যন্ত অবশ হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদের কেন্দ্রে (প্রাণে) প্রত্যাগত হয়; তখন সকলে বলে যে, লোকটির মন দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে। ঐ সময়ে সে আর দেখিতে, শুনিতে, কথা বলিতে, আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে বা চিন্তা করিতে পারে না। সেই ব্যক্তি সেই সময়ে প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়।[১৬] দেহ

১৫। "স যদা প্রতিবুধ্যতে। যথাগ্নের্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্ এবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

১৬। 'যত্রৈতৎ পুরুষঃ আর্ত্তো মরিষ্যন্ আবল্যং ন্যেত্য মোহং নৈতি তদাহুঃ উদক্রমীচ্চিত্তম্। ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

ত্যাগ করিবার সময় 'প্রাণ' ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে সঙ্গে লইয়া যায়। মরণাপন্ন ব্যক্তির মহাপ্রস্থানের সময় দেহী বা জীবাত্মা উহার দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন, ধারণ, বাক ও প্রজনন ইত্যাদি শক্তিসমূহকে ও 'অহমস্মি', 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাকার জ্ঞানগুলিকেও সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। যখন 'প্রাণ' দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন দেহযন্ত্রের চেতন, অবচেতন ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়াগুলি এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তিও প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া যায়। এই সমস্ত শক্তির সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি যেমন রূপ, শব্দ ও গন্ধ ইত্যাদিও প্রত্যাহৃত হয়। যখন দর্শনশক্তিটি চলিয়া যায় তখন যন্ত্রস্বরূপ চক্ষু দ্বারা যাহা দেখা যায় তাহা অর্থাৎ 'রূপ' বা 'আকার'-ও মৃতব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হয় না।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি ও ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। যখন কোন ইন্দ্রিয়শক্তি প্রত্যাহৃত হয় তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়টিও উহার সহিত প্রত্যাহৃত হয়। যদি শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকে তাহা হইলে সর্বপ্রকার শব্দ বন্ধ হইয়া যায় ; অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত হইলে শব্দসমূহও প্রত্যাহৃত হয়। এক্ষণে আমরা যে সমস্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি তাহা রুদ্ধ হইলে বাক্‌শক্তি তখন কিভাবে থাকে? উহা ঐ সময়ে সুপ্তভাবে থাকে এবং ঐ বাক্‌শক্তির দ্বারা যাহা প্রকাশিত হয় সেই 'নাম'-গুলিরও অর্থাৎ বস্তুবাচক নামগুলিরও অস্তিত্ব চলিয়া যায়। ঐ একই প্রকার কারণে ঘ্রাণশক্তিটি প্রত্যাহৃত হইলে উহার সহিত গন্ধাদি আঘ্রাণরূপ ক্রিয়াও চলিয়া যায়। আবার এইরূপ মন ও বুদ্ধি যখন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় তখন চিন্তাশক্তি, স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রত্যক্ষ, অনুমানযোগ্য বিষয়সমূহ ও মানসিক ভাবরাশি সমস্তই অন্তর্হিত হয়। মৃত্যুকালে দৈহিক

ও মানসিক শক্তিসমূহ এইরূপ নির্বিশেষভাবে আত্মা বা প্রাণে একীভূত হইয়া থাকে। পূর্বেই আমরা জানিয়াছি যে, 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য; একটির অভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গে অপরটিরও অভাব হইবে। সুতরাং 'প্রাণ' চলিয়া গেলে তৎসঙ্গে প্রজ্ঞাও চলিয়া যাইবে। যখন কাহারও এইরূপ অবস্থা ঘটে তখন বুঝিতে হইবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া জীবাত্মার সহিত থাকে এবং ঐ জীবাত্মা আবার অন্য এক শরীর ধারণ করিয়া উহাদিগকে প্রকাশ করে। গভীর নিদ্রা বা সুষুপ্তির পরে জাগরণের সময় যেমন মানসিক ও দৈহিক শক্তিসমূহ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে সেইরূপ চিরনিদ্রা বা মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম গ্রহণের সময় সুপ্তশক্তিসমূহ প্রাণরূপ আধার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন নূতন ইন্দ্রিয়সমূহ সৃজন করে এবং উহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে থাকে।[১৭] কিন্তু এই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সৃষ্টি

১৭। "ন শৃণোতি ন পশ্যতি ন বাচা বদতি ন যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাব সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি, চক্ষুঃ সর্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি, শ্রোত্রং সর্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি, মনঃ সর্বৈ র্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি। যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠে-রন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবভ্যো লোকাঃ।" কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৩

"স যদাঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রামতি সহৈ বৈতৈঃ সর্বৈরুৎক্রামতি বাগস্মাৎ সর্বাণি নামান্যভিবিসৃজতে। বাচা সর্বাণি নামান্যাপ্নোতি। ...সৈষা প্রাণে সর্বাপ্তিঃ।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৪

"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা বা প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ। স হ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৪

করে সেই শক্তিটি কি? উহাই 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তি এবং এই শক্তির মধ্যেই পূর্বজন্মার্জিত বাসনা, প্রবৃত্তি ও সংস্কারসমূহ সুপ্তভাবে অবস্থান করে।

যখন ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই যখন তাহার নিজ নিজ কার্য করিতে বিরত থাকে তখন ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া একেবারে লুপ্ত না হইয়া সুপ্তভাবেই থাকে; সুতরাং এইরূপ অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করে না এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সকলের আপেক্ষিক সত্তাও ঐ সময় অন্তর্হিত হয়। জ্ঞান এবং চৈতন্যের কেন্দ্র দেহী বা জীবাত্মা। এই দেহী 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত। এই প্রাণেরই এক অংশ ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে এবং অপর অংশ গন্ধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। যেমন ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলিব কোন সম্পর্ক না থাকিলে ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব থাকিতে পাবে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আত্মা বা বিষয়ীও আছে।

পূর্বে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি সেইগুলির পুনরায় আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ 'প্রাণ' বা জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অধীন। 'প্রাণ' ও 'প্রজ্ঞা' এই দুইটি এক সঙ্গে বাস করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষসাপেক্ষ, কারণ ঐ বিষয়গুলির অস্তিত্ব উপলব্ধিকরণক্ষম শক্তিসমূহের উপরই নির্ভর করে; অর্থাৎ যাহা দ্বারা ঐ বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ হইবে সেই শক্তির

অর্থাৎ যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা, যাহা প্রজ্ঞা তাহাই প্রাণ। এই প্রাণ এবং প্রজ্ঞা মিলিত হইয়া শরীরে বাস করেন এবং মিলিত হইয়া শরীর হইতে নির্গত হন।

অভাব হইলেই ঐ বিষয়গুলির সত্তা বা অস্তিত্ব থাকা বা না-থাকা উভয়ই সমান। যদি আমাদের দর্শনশক্তি লোপ পায় তাহা হইলে কোন প্রকার বর্ণ ই আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না। আমাদের শ্রবণশক্তি কার্যক্ষম না থাকিলে কোন প্রকার শব্দই আমরা শ্রবণ করিতে পারি না। এইরূপে প্রমাণ করিতে পারা যাঁয় যে, প্রত্যক্ষের বিষয়গুলির সহিত সংবেদন বা জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। প্রত্যক্ষরূপ ক্রিয়াটিও আবার ইন্দ্রিয়শক্তির উপরে নির্ভর করে। প্রত্যক্ষের একটি বিষয়কে একখণ্ড বস্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যেরূপ বস্ত্রখণ্ড ও বস্ত্রখণ্ডস্থিত সূত্রগুলির মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই সেরূপ প্রত্যক্ষের একটি বিষয়ের সহিত সংবেদন-ক্রিয়া ও অনুভবশক্তিসমূহেরও কোন প্রভেদ নাই। অর্থাৎ যেমন বস্ত্রখণ্ড বলিলে বস্ত্রখণ্ডের সূত্রগুলিকেই বুঝায়, কারণ ঐ সূত্রগুলি ব্যতীত বস্ত্রের আর অন্য কোন উপাদান নাই সেরূপ প্রত্যক্ষের বিষয় বলিলে উহা প্রত্যক্ষীকরণ ও অনুভবশক্তির সমষ্টিকেই বুঝায়। আবার প্রত্যক্ষীকরণ ও অনুভব-শক্তিরূপ সূত্রগুলি প্রাণশক্তি হইতে আবর্তিত হইয়াই যেন নির্মিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই বিশ্বজগতের সত্তা বা অস্তিত্ব প্রাণ ও প্রজ্ঞা ভিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মাই বিশ্বজগতের কেন্দ্র বা অধিষ্ঠান। আত্মা আমাদের প্রত্যেকেরও কেন্দ্রস্বরূপ। আত্মা প্রাণের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আত্মা হইতেই এই জীবনের এবং যাবতীয় ইন্দ্রিয়শক্তির উৎপত্তি। বস্তুতঃ এই দৃশ্যমান বাহ্যজগতের মূলই হইতেছেন একমাত্র আত্মা।

পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, প্রাণ বা প্রজ্ঞার সংখ্যা বহু নহে, উহা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। যে জীবনীশক্তি আপনার ভিতর আছে, সেই জীবনীশক্তিই আমার এবং অপরের ভিতরেও

আছে। জীবনীশক্তি যেরূপ বহু নহে কিন্তু এক, প্রজ্ঞাও সেইরূপ এক ; সুতরাং আপনার মধ্যে যে প্রজ্ঞা বর্তমান সেই প্রজ্ঞাই আমার এবং অপরের মধ্যেও বর্তমান। এই নিখিল বিশ্বের সর্বত্রই 'প্রাণ' বা 'প্রজ্ঞা' একটি ভিন্ন দুইটি নহে। অপরের প্রজ্ঞার সহিত আমাদের প্রজ্ঞার তুলনা করিয়া পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কেবল বাহ্যলক্ষণ দ্বারাই অনুমিত হইতে পারে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের মূলে 'প্রজ্ঞা' অবস্থিত। কোনও বাক্য উচ্চারিত হইলে ঐ বাক্যের তাৎপর্য প্রজ্ঞা বা 'অহমস্মি' জ্ঞান না থাকিলে বুঝিতে পারা যায় না। এইরূপ কর্ণদ্বারা কোনও প্রকার শব্দ শ্রবণ 'প্রজ্ঞা' ভিন্ন সম্ভবপর নহে। যখন উহা কোনও বিষয়ে বিশেষ ভাবে নিবিষ্ট থাকে তখন কোনও বস্তু আমাদের চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই না।[১৮]

এইরূপ দেখা যায় যে, যখন কেহ পথের মধ্যে কোনও একটি বস্তুবিশেষের উপর একাগ্রতা সহকারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তখন তাহার সম্মুখ দিয়া যাহা-কিছু চলিয়া যাক না কেন তাহা তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ কোন ব্যক্তি যদি একটি শব্দ বিশেষের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে অপরাপর শব্দ আর তাহার শ্রুতিগোচর হয় না; এমন কি সেই সময়ে যদি কেহ তাহাকে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়াও সম্ভাষণ করে তাহা হইলেও সে তাহা শুনিতে পায় না। সেরূপ যদি কাহারও মন বিশেষ কোনও চিন্তায় বা ভাবে নিমগ্ন থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তির দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন বা

১৮। 'ন হি প্রজ্ঞাপেতং চক্ষু রূপং কিঞ্চন প্রজ্ঞাপয়েদন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতদ্রূপং প্রজ্ঞাসিষমিতি।'

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৭

অন্য কোনও প্রকার অনুভূতিই তখন হইবে না। অতএব সংক্ষেপে ইহাই বলিতে পারা যায় যে, প্রজ্ঞা ভিন্ন চিন্তাধারার ক্রমিক উৎপন্ন হয় না; অর্থাৎ একটি চিন্তা দূর হওয়ার পরই যে অপর একটি চিন্তার উদয় হয় এই প্রকার নিয়ম প্রজ্ঞা ভিন্ন হইতে পারে না। আবার প্রজ্ঞা বা চৈতন্য না থাকিলে কোনও বিষয় জানিতে পারা যায় না। সেজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে: "প্রকৃত দ্রষ্টাকেই আমাদের জানিতে হইবে। বাক্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া উহা যাহার দ্বারা কথিত হইয়াছে সেই বক্তা বা পুরুষকেই জানিতে চেষ্টা করিবে।"[১৯] অর্থাৎ "সেই বক্তা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর; দ্রষ্টা কোথায় তাহা অনুসন্ধান কর; বাক্যের অর্থ কি তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত বক্তাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। দৃষ্টির বিষয় কি, তাহা না ভাবিয়া প্রকৃত দ্রষ্টাকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর। শব্দ কি, তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত শ্রোতা কে তাহাই জানিতে চেষ্টা কর।"

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ 'শব্দ' কি এবং তাহার উৎপত্তি কি প্রকারে হয় ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু শ্রোতা অর্থাৎ যিনি ঐ শব্দ শ্রবণ করিতেছেন তাহা জানিতে তাঁহারা মোটেই উৎসুক নহেন। পক্ষান্তরে বেদান্ত-দর্শনাভিজ্ঞ মনীষীরা সমস্ত বিষয়ের মূল উৎস কোথায় তাহারই অনুসন্ধান করেন। শব্দ বায়ুর কম্পন হইতে জাত কি-না?—তাহা লইয়া তাহারা ব্যস্ত হন না। একটি শব্দ উৎপন্ন হইতে যে-কোনও প্রকার স্পন্দন বা কম্পনেরই প্রয়োজন হউক না

১৯। "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত; বক্তারং বিদ্যাৎ।"......"ন রূপং বিজিজ্ঞাসীত, রূপবিদ্যং বিদ্যাৎ।" "ন শব্দং বিজিজ্ঞাসীত, শ্রোতারং বিদ্যাৎ।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৮

কেন, তাহা আমাদের শ্রবণশক্তির সহিত নিশ্চয়ই সম্বন্ধ থাকিবে। এক্ষণে যদি আমাদের শ্রবণশক্তিটি প্রত্যাহৃত হয় তাহা হইলে কে ঐ শব্দটি শ্রবণ করিবে? 'শব্দ' এই ব্যাপারটি কি—তাহা জানিবার জন্য সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক কি? প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির ধর্ম কি তাহা বিদিত হওয়া আবশ্যক; তাহার পরে উহাদের মূল কোথায় তাহা দেখা প্রয়োজন; সর্বশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের জ্ঞাতা বা উপলব্ধির কর্তা কে তাহাই আমাদের জানা আবশ্যক। কোন খাদ্যের কি প্রকার স্বাদ তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া কে আস্বাদন করিতেছেন তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর। সুখ ও দুঃখ এই দুইটি কি তাহা না ভাবিয়া যিনি উহাদের অনুভব করিতেছেন তাঁহাকেই বিদিত হও।[২০]

এইরূপে 'চিন্তা'-ব্যাপারটি কি তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া যিনি চিন্তা কবিতেছেন তাঁহাকে বিদিত হও। এই সকল প্রত্যক্ষের বিষয়গুলির অর্থাৎ চিন্তা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির সহিতও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির সম্বন্ধ আছে। যদি বিষয়গুলির সহিত বিষয়ী আত্মার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ইত্যাদি বিষয়ের সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের কার্য থাকিত না এবং যদি ইন্দ্রিয়ের কার্য না থাকিত তাহা হইলে বিষয়গুলিও থাকিত না। কেবল বিষয় অথবা কেবল বিষয়ীর দ্বারা কিছুই সম্পন্ন হয় না।[২১]

২০। "নান্নরসং বিজিজ্ঞাসীত। অন্নরসস্ত বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।"
"ন সুখদুঃখে বিজিজ্ঞাসীত। সুখদুঃখয়ো বিজ্ঞাতারং বিদ্যাৎ।"

২১। "তা বা এতা দশৈব ভূতমাত্রা অধিপ্রজ্ঞং, দশ প্রজ্ঞমাত্রা অধিভূতং। যদ্ধি ভূতমাত্রা ন স্যু র্ন প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্যু র্যদ্বা প্রজ্ঞামাত্র ন স্যু র্ন ভূতমাত্রাঃ স্যু। ন হ্যন্যতরতো রূপং কিঞ্চন সিদ্ধেৎ। নো এতন্নানা।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৮।৩

দেবরাজ ইন্দ্র প্রজ্ঞাকে রথচক্রের মধ্যস্থল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেহটি যেন একটি রথ এবং চক্রের পরিধিটি যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ দ্বারা গঠিত। চক্রের নাভি হইতে নেমি পর্যন্ত যে দণ্ডগুলি থাকে সেই 'অর'-গুলি যেন বাহ্যবিষয় প্রকাশক ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ এবং চক্রের নাভিটি যেন প্রাণ বা জীবনীশক্তি।[২২] উপরোক্ত উপমার দ্বারা ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়শক্তিরূপ দণ্ড-গুলির উপরে স্থাপিত এবং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি আবার প্রাণকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই প্রাণ বা জীবনীশক্তিকে প্রজ্ঞা ও আত্মা হইতে পৃথক করা যায় না। ইহা জরা-মরণরহিত এবং আনন্দস্বরূপ আত্মা[২৩] "সৎকার্য অথবা অসৎকার্যের দ্বারা

২২। "তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবরা অর্পিতা, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ, স এষঃ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ।"

—কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৮

যেমন রথচক্রের অরগুলিতে নেমি বা পরিধিস্বরূপ গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড স্থাপিত হয় এবং নাভি অর্থাৎ চক্রের মধ্যস্থিত ছিদ্রযুক্ত গোলাকার কাষ্ঠের অরগুলি স্থাপিত হয় সেইরূপ (নেমি স্থানীয় নামাদি বিষয়গুলিরও অরস্থানীয় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অরস্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিও নাভিস্বরূপ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা ; ইনিই আনন্দস্বরূপ এবং জরা ও মরণরহিত।"

গীতায় এবং কঠোপনিষদেও এই উদাহরণটি লওয়া হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোও এই উদাহরণটি দিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতেই এই দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

২৩। "ন সাধুনা কর্ম্মণা ভূয়ান্নো এবাসাধুনা কনীয়ান্। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যো নুনুৎসতে। এষ

আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কোনও প্রকার বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। সংসারের পাপ এই আত্মাকে কলুষিত করিতে পারে না কিম্বা ইহার কোনও প্রকার পরিবর্তনও হয় না। আমাদের আত্মা ধর্মাধর্মরহিত ; তিনি পাপীও হন না, বা পুণ্যবান্‌ও হন না। সর্বসময়েই তিনি পূর্ণ ও পবিত্র। সৎ ও অসৎকর্মের সহিত আত্মার কোনও সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু এই সমস্ত কর্মের সহিত জীবাত্মার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে, কারণ যাহা-কিছু করা যায় তাহার ফল জীবাত্মাই ভোগ করিবেন ; অর্থাৎ 'আমি' আমার' জ্ঞান লইয়া আমরা যেরূপই কর্ম করি না কেন, তাহার ফল আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। তাহা ছাড়া আমাদের উত্তমরূপে ইহা বুঝা উচিত যে, প্রজ্ঞা ও জীবনীশক্তি ব্যতিরেকে কোন প্রকার সদসৎ কর্মই সম্পন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান ও

লোকপাল এষ লোকাধিপতিঃ। এষ সর্বেশ্বরঃ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ স ম আত্মেতি বিদ্যাৎ।" —কৌষীতক্যুপনিষৎ ৩।৯

অর্থাৎ "এই আত্মা পুণ্যকর্ম দ্বারা অধিক হন না, অথবা পাপকর্মের দ্বারাও ন্যূন হন না। যেহেতু এই প্রাণ 'প্রজ্ঞা উপাধিবিশিষ্ট আত্মাই ; স্বর্গাভিলাষী জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্তলোক হইতে উর্ধলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন ও তাহাকে পুণ্য-কর্ম করান। এই আত্মাই জীবকে এই প্রত্যক্ষ মর্তলোক হইতে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং তাহাকে অসাধু-কর্ম অর্থাৎ পাপকর্ম করান। এই আত্মাই লোকপাল অর্থাৎ সাধু লোককে সুখ এবং অসাধু লোককে দুঃখ প্রদান করেন. এই লোকপাল আত্মাই লোকাধিপতি। এই লোকাধিপতি আত্মাই সর্বনিয়ন্তা। এই সর্বেশ্বরত্বগুণসম্পন্ন আত্মাই আমার (ইন্দ্রের) স্বরূপ, ইহাকেই অবগত হইতে হয়। উক্ত আত্মাকেই আমার স্বরূপ বলিয়া জানিবে।" তবে ইহা সত্য যে, আত্মা স্বরূপতঃ কাহাকে পাপও প্রদান করেন না, অথবা পুণ্য দান করেন না। আত্মা নিষ্ক্রিয় ও স্বাক্ষীস্বরূপ।

বুদ্ধির মূল কারণ যিনি—তিনিই এই বিশ্বজগতের অধিপতি ও সকলের পালনকর্তা। তিনিই এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আমার (ইন্দ্রের) প্রকৃত স্বরূপ। এই আত্মজ্ঞান সকল ব্যক্তিকেই অমরত্বের অধিকারী করে। একমাত্র আত্মজ্ঞানই মনুষ্যজাতিকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাইতে সমর্থ এবং এই পূর্ণতা লাভ হইলেই যে রাজ্যে চিরশান্তি ও অনাবিল আনন্দ বিরাজিত সেই রাজ্যে মানব গমন করিতে পারে।”

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মে অস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

—ছান্দোগ্যোপনিষৎ

আমার সমস্ত অঙ্গ এবং বাক্, প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন, বল ও ইন্দ্রিয়সমূহ পরিতৃপ্ত হউক। আমি যেন উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট তাঁহার প্রত্যাখ্যান না হউক্। উপনিষদে আত্মার যে সমস্ত ধর্ম কথিত আছে তাহা আত্মনিষ্ঠ আমাতে প্রকাশিত হউক্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ আত্মানুসন্ধান ॥

হিন্দুদের পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির সহিত গ্রীস দেশের পৌরাণিক গল্পসমূহের বহু পরিমাণে সাদৃশ্য আছে। এই দুই বিভিন্ন জাতির পুরাণে আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতারা ও অসুরেরা নরদেহ ধারণ করিয়া কিরূপে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের মত বাস করিয়াছিলেন। দেবতারা এবং অসুররা যে এক সঙ্গে বাস করিতেন এবং পরস্পর যুদ্ধ করিতেন তাহার উল্লেখ আমরা প্রাচীন উপনিষদসমূহেও দেখিতে পাই। কথিত আছে যে, এই নিখিল বিশ্বের আদি স্রষ্টা প্রজাপতি একদিন দেবগণকে ও অসুরগণকে বলিয়াছিলেনঃ "তোমরা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভুত্ব ও ক্ষমতা স্থাপন করিবার জন্য কি কারণে যুদ্ধ করিতেছ? তোমরা আত্মাকে বিদিত হও, কারণ যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে তিনিই শান্তি লাভ করেন। আত্মা পাপবর্জিত, বার্ধক্য ও মৃত্যু রহিত। আত্মার শোক নাই, দুঃখ নাই, ক্ষুধা নাই ও তৃষ্ণা নাই। আত্মা সত্যকাম, অর্থাৎ আত্মার কামনা কখনও বিফল হয় না বা কখনও অপূর্ণ থাকে না। আত্মা সত্যসঙ্কল্প ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত; আত্মার মিথ্যা কিছুই নাই, সুতরাং আত্মার সকল প্রকার চিন্তাও সত্য। সকলেরই এই আত্মাকে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যিনি এই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহার অপ্রাপ্য বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। তাঁহার সমস্ত কামনাই পরিপূর্ণ হইবে; তিনি সর্বশক্তিমান পুরুষ হইবেন, সর্বপ্রকার ক্ষমতাই তিনি প্রাপ্ত

হইবেন এবং তিনি এই সসাগরা পৃথিবীর ও স্বর্গাদির অধীশ্বর হইবেন।[১] দেবতারা এবং অসুরেরা এই উভয় পক্ষই অতিশয় ক্ষমতাপ্রিয় ও নিতান্ত অসুখী ছিলেন ; সেজন্য তাঁহারা প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন যে, তাহা হইলে তো সকল জগতের এবং জীবের উপর কর্তৃত্ব করিবার প্রশস্ত পন্থা পাওয়া গিয়াছে! অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক ছান্দোগ্য উপনিষদে উপরি উক্ত উপাখ্যানটি এইস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছান্দোগ্য-উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত।

হিন্দুদের সর্বপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকে "বেদ" আখ্যা দেওয়া হয়। এই 'বেদ' চারিভাগে বিভক্ত, যথা ঋক্ সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বৈদিক যুগে সামবেদের মন্ত্রগুলি গান করা হইত। সেই সামগান হইতে সঙ্গীতের বিজ্ঞান ভারতে সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুরা সর্বপ্রথম সঙ্গীতে সপ্তস্বর ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরে যন্ত্রসঙ্গীতেও সপ্তস্বর ও তিনটি সপ্তক, উদারা, মুদারা ও তারা ব্যবহার করিত। প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্মের সময় সামবেদীয় মন্ত্রগুলি সপ্তস্বরে গীত হইত।[২]

যাহাহউক, ছান্দোগ্য-উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, দেবতারা এবং অসুররা প্রজাপতির নিকট হইতে সর্বময় কর্তা হইবার

১। য আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো
বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ
সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ স
সর্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্
যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ॥
—ছান্দাগ্যোপনিষৎ ৮।৭।১

২। ঋক্ ও অন্যান্য প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাবলীতে এই সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

গূঢ়তত্ত্ব জানিতে পারিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে উৎসুক হইলেন। কি প্রকারে এই আত্মার জ্ঞান লাভ হইতে পারে এই বিষয় লইয়া তাঁহারা আপনাদের ভিতর আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং যাহা প্রাপ্ত হইলে আর কোন কিছু পাইতেই বাকি থাকে না—সমস্ত বাসনাই পরিপূর্ণ হয় এবং সমস্ত পৃথিবীরই অধীশ্বর হইতে পারা যায় তাহারই অনুসন্ধানে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, এই অসুরগণ ভূত প্রেত-জাতীয় জীব নহেন ; ইহারা মনুষ্যেরই মতন একটি জাতি ছিলেন, কিন্তু ঘোরতর ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ধারণাই ছিল না। তঁহারা বস্তুতন্ত্রবাদ ছিলেন এবং মনে করিতেন যে, এ জড়দেহই সর্বস্ব, এই দেহের নাশের সহিত সবই শেষ হইয়া যায়। সমস্ত বিশ্বের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিলাষ তাহারা সর্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতেন, কিন্তু ইহাদের এই বাসনা কোন কালেই পূর্ণ হয় নাই। যাহাদের বাসনা অসংখ্য, তাহাদের অভাবও অসংখ্য। অসুরগণের অবস্থাও ঠিক সেরূপই হইয়াছিল। আবার কোন একটি বাসনা পূর্ণ হইলে দেখা যায়, অপর বাসনাগুলি আরও তীব্র বেগে জাগ্রত হইয়া উঠে ; সেইজন্য অসুররাও সর্বদাই নিজেদের অভাবগ্রস্ত বোধ করিত এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান দেবতাদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ও শক্তিমান্ হইবার চেষ্টা করিত। বাস্তবিক ইহসর্বস্ববাদী জড়ভাবাপন্ন এই সমস্ত লোকদেরই বেদে 'অসুর' বলা হইয়াছে। আর যাঁহারা ধর্মাপরায়ণ, আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন, স্বার্থত্যাগী, পরহিতকারী : যাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ, ঐশ্বর্য ও পার্থিবভোগকে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য না মনে করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ ও সচ্চিদানন্দ-

স্বরূপ ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন, বেদে তাঁহাদিকেই 'দেবতা' বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে।[৩]

এই সকল দেবতারা এবং অসুরগণ স্থির করিলেন যে, যদি তাঁহারা তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহাকে কোনও সত্যদর্শী ঋষির নিকট আত্মজ্ঞান লাভের উপায় জানিবার জন্য পাঠাইতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিবার সুবিধা হইবে। এইরূপ মনে করিয়া দেবগণ ইন্দ্রের নিকট এবং অসুরগণ বিরোচনের নিকট গমন করিলেন। উভয়পক্ষই তাঁহাদের

৩। ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকদিগের বিষয় বর্ণিত আছে; যথা,

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥

*   *   *   *

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্।
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাঽসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥

অধিপতিকে আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বস্তুতঃ উভয়পক্ষেরই সর্বপ্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল; মনুষ্যের যত প্রকার পার্থিব ভোগ্য বিষয়ের অভিলাষ থাকিতে পারে, তাহার কোনটিরই তাহাদের অভাব ছিল না। যদিও তাঁহাদের প্রচুর ধন, সম্পত্তি ও বিলাস সামগ্রী ছিল, যদিও তাঁহারা অসীম মানসিক শক্তি (Psychic Power)-সম্পন্ন ছিলেন এবং যাহা কামনা করিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইতেন, তথাপি এই সকল ঐশ্বর্যশালী হইয়াও তাঁহাদের বিষয়ভোগের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় নাই। তাঁহারা সর্বদা অতৃপ্ত বাসনাজনিত দুঃখই অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহাদের যে সকল শক্তি ও সামর্থ্য ছিল তাহা অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ও ক্ষমতা পাইবার জন্য তাঁহারা লালায়িত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা যখন প্রজাপতির নিকট শুনিলেন যে, এমন কোন বস্তু আছে যাহা প্রাপ্ত হইলে নিখিল বিশ্বের অধিপতি হইতে পারা যায়, তখন তাঁহারা ঐ শ্রেষ্ঠ বস্তুটি অবিলম্বে লাভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তারপর দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুরপতি বিরোচন আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অনুসন্ধানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যাত্রা করিলেন। উভয়েই সেই সময়ে সর্বপ্রকার ভোগ-বিলাস বর্জন করিলেন; তাঁহাদের সুন্দর পরিচ্ছদাদি, যাবতীয় ঐশ্বর্য ও বিলাসদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া এবং এমন কি পরস্পরের সহিত কোনও

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্॥"

—গীতা ১৬।১১-১২

সংশ্রব না রাখিয়া জিজ্ঞাসুর ন্যায় দীন ও সরলভাবে সকলের অপেক্ষা বিজ্ঞ ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা ঠিক ঐরূপ সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ কোথাও অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া অবশেষে প্রজাপতি-সমীপে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সমিৎপাণি হইয়া পূজোপহার নিবেদন করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে রিক্তহস্তে গুরু, দেবতা ও রাজার নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ। এই-জন্য তাঁহারা হব্য, ফল এবং যজ্ঞকাষ্ঠাদি প্রজাপতিকে ভক্তি-সহকারে নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার সম্মতি পাইয়া তাঁহারা তাঁহার শিষ্যরূপে পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রত অবলম্বন করিলেন এবং বিধিসহকারে গুরুর সেবা করিয়া বত্রিশ বৎসর গুরুর নিকট বাস করিলেন। একদিন প্রজাপতি তাঁহার শিষ্যদ্বয়কে তাঁহার নিকট আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তাঁহারা দুইজনেই উত্তর করিলেনঃ "ভগবন্, আপনি বিশ্বজগতের বিধাতা প্রজাপতি; আপনার নিকট শুনিয়াছি যে, যদি কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরম সুখী হয়, তাহার সমস্ত প্রকার শক্তিলাভ হয়, কিছুই আর তাহার অপ্রাপ্তব্য বলিয়া বাকি থাকে না। এই আত্মা আবার পাপ ও জরারহিত অজর এবং অমর; এই আত্মার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কিছুই নাই; ইনিই সত্যকাম অর্থাৎ ইঁহার যাবতীয় কামনা সকল সময়েই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; ইনিই সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ ইঁহার চিন্তাও কখনও নিষ্ফল হয় না। আমরা এই প্রকার আত্মাকে জানিবার অভিলাষে আপনার শরণাগত হইয়াছি, আপনি উপদেশ দান করুন।"

ইন্দ্র ও বিরোচনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ প্রজাপতি শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধি শুদ্ধ কি-না তাহা পরীক্ষা করিবার

জন্য একেবারেই তাঁহাদের ঈপ্সিত আত্মজ্ঞান দান করিলেন না, প্রকারান্তরে তিনি তাঁহাদিগকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন যাহা দ্বারা তাঁহারা অন্তরস্থিত অন্তর্যামী আত্মার অনুসন্ধান করিয়া সেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন। যে আচার্য তাঁহার শিষ্যদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতির পথে ক্রমে ক্রমে পরিচালিত করেন এবং যাহাতে শিষ্যেরা আপন চেষ্টায় সেই একমাত্র সত্যবস্তুকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন সেরূপ উপায় অবলম্বন করেন সেই আচার্যই শ্রেষ্ঠ। এজন্য প্রজাপতি বলিলেনঃ "বৎসগণ, চক্ষুতে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিই সেই আত্মা। এই আত্মাই জন্ম, শোক, দুঃখ ও পাপবর্জিত। ইহার মৃত্যু নাই বা মৃত্যুর শঙ্কাও নাই। এই পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া লোক সমগ্র পৃথিবী ও ইপ্সিত বিষয়সমূহ পাইতে পারে।"[৪] প্রজাপতির এইপ্রকার কথা শুনিয়া তাঁহারা সংশয়ে পড়িলেন। "চক্ষুতে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিই আত্মা" এই বাক্যের গূঢ় অর্থ ইন্দ্র ও বিরোচন ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন যে, চক্ষুর তারাতে যে ছায়া দেখা যায়, ঐ ছায়াকেই বোধ হয় গুরুদেব 'আত্মা' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ আমরা যদি কাহারও চক্ষুর তারকাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি তাহা হইলে আমাদেরই প্রতিবিম্বটি ক্ষুদ্র ছায়াকারে ঐ চক্ষুর তারকাতে প্রতিফলিত দেখিয়া থাকি। প্রজাপতি অবশ্য এইপ্রকার ছায়াকে আত্মা বলিয়া মনে করিবার উপদেশ দান করেন নাই। তিনি কেবল শুদ্ধচিত্ত যোগিগণ যাঁহাকে দ্রষ্টারূপে অনুভব করিয়া থাকেন সেই দর্শনকর্তা ও ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক আত্মরূপী পুরুষকেই উল্লেখ করিয়া

৪। তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি। —ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।৭।৪

উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃত অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র ও বিরোচন প্রজাপতিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "ভগবন্, যাঁহাকে দর্পণে বা সলিলের ভিতর দেখা যায়—তিনি কে? চক্ষুর মধ্যে যাঁহাকে দেখা যায় তিনিও কি সেই একই পুরুষ?"[৫] শিষ্যেরা যে প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে নাই ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রজাপতি উত্তর করিলেনঃ "অবশ্য তোমরা যাহা বলিতেছ সেই সমস্ত পদার্থের ভিতরেও আত্মাকে দেখা যায়, সুতরাং সেই আত্মাকে বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।" প্রজাপতি তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের বুদ্ধিশক্তি আরও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য আবার বলিলেনঃ "একটি জলপূর্ণ পাত্রে তোমাদের আকৃতি নিরীক্ষণ করিও এবং তাহাতে আত্মাকে দর্শন করিতে পাও কি-না তাহা আমাকে বলিও।"

অনুগত শিষ্যদ্বয় গুরুর আদেশানুযায়ী জলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ "ভগবন্, আপনি যাহা দেখিবার জন্য আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া প্রজাপতি বলিলেনঃ "কিন্তু তোমরা প্রকৃতপক্ষে আত্মা দেখিয়াছ, না আর-কিছু দেখিয়াছ? শিষ্যেরা বলিলেনঃ "ভগবন্, আমরা জলের মধ্যে মস্তক হইতে পদ পর্যন্ত আমাদের আকৃতি স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াছি, উহার মধ্যে আমাদের শরীরের কোনও অংশের ব্যতিক্রম হয় নাই—এমন কি আমাদের কেশ ও নখর পর্যন্ত দেখিয়াছি।" প্রজাপতি তখন তাঁহাদিগের সংশয় অপনোদনের জন্য আবার সস্নেহে বলিলেনঃ "তোমরা

৫। "অথ যোঽয়ং ভগবোঽপ্সু পরিখ্যায়তে যশ্চায়মাদর্শে কতম এষ ইত্যেষ উ এবৈষু সর্বেষ্বেন্তেষু পরিখ্যায়ত ইতি হোবাচ।"—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।৭।৪

তোমাদের কেশ ও নখর সংস্কার করিয়া উত্তম বেশভূষাদিতে সজ্জিত হইয়া পুনরায় জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে দৃষ্টিপাত কর এবং যাহা দেখিতে পাও তাহা আমাকে বল।” তখন ঐ শিষ্যদ্বয় প্রজাপতির আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিবার জন্য কেশ ও নখরাদির সংস্কার সাধন করিয়া বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইলেন ও জলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। তাহার পর প্রজাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “বৎসগণ, তোমাদের স্বরূপ বা আত্মাকে কি দেখিতেছ?” তাঁহারা উত্তর করিলেন, “ভগবন্, আমরা এখন যেমন পরিষ্কৃত বেশভূষায় সজ্জিত আছি ঠিক সেইরূপ অবস্থাতেই আমাদের দেখিতেছি।’ তাহা শুনিয়া প্রজাপতি বলিলেনঃ “উহাই তোমাদের আত্মার স্বরূপ, উহাই সেই দুঃখ ও ভয়বর্জিত অবিনশ্বর ব্রহ্ম; উহাকে ভাল করিয়া বিদিত হও এবং উপলব্ধি কর।” ইহা শুনিয়া শিষ্যদ্বয় শান্তচিত্তে প্রস্থান করিলেন। আচার্যরূপী প্রজাপতি তাহাদিগকে বহুদূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় আহ্বান করিয়া বলিলেনঃ “তোমরা তোমাদের আত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছ, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই ভ্রান্ত আত্মবিদ্যা অনুসরণ করিবে সেইই বিনষ্ট হইবে।” ইন্দ্র এবং বিরোচন উভয়েই প্রজাপতির এই-প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়াও কিন্তু আর প্রত্যাগত হইলেন না। তাঁহারা চিন্তা করিলেন তাঁহারা তাঁহাদের আত্মস্বরূপকে সত্যসত্যই উপলব্ধি করিয়াছেন, সুতরাং কোন সংশয় না রাখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহারা নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন, প্রজাপতির কথায় আর প্রত্যাবর্তন করিলেন না।

অতঃপর বিরোচন স্থূলদেহই আত্মার স্বরূপ এই নিশ্চয় করিয়া অসুরগণের নিকটে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং

তাঁহাদিগের নিকট 'দেহাত্মবাদ'[৬] প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি অসুরদিগকে আধুনিক নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীদের[৭] মতানুযায়ী বস্তুতন্ত্র বা জড়বাদের উপদেশগুলি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন ঃ "স্থূল দেহই আমাদের আত্মা ; কেবল এই দেহেরই পরিচর্যা করিতে হইবে এবং এই দেহকেই পূজা করিতে হইবে। এইরূপে স্থূল দেহের পূজা ও সেবার দ্বারা আত্মা মহিমান্বিত হইবেন। যিনি দেহকে আত্মা জানিয়া ইহাব পবিচর্যা করিবেন তিনিই সমগ্র পৃথিবীর এবং স্বর্গাদি লোকের অধীশ্বর হইতে পারিবেন ; সমস্ত বস্তুই তাঁহার করতলগত হইবে।" অসুররা বিরোচনের উপদেশানুযায়ী সম্পূর্ণভাবে দেহাত্মবাদী হইয়া স্থূল শরীরটিকেই নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া তাহার পূজা করিতে লাগিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, অসুর প্রকৃতিসম্পন্ন লোকেরা আজিও দেহের পরিচর্যা করিয়া ত্রিভুবন জয় করিব এইরূপ অভিমান কবিয়া থাকে।

বর্তমান যুগে পৃথিবীতে এইরূপ অসুর প্রকৃতির লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, যাঁহারা অজ্ঞেয়বাদী, জড়বাদী এবং স্বার্থসুখ পাইবার জন্যই সর্বদা লালায়িত তাঁহাদের মধ্যেই আসুরিক প্রবৃত্তিসমূহ পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের শরীর ব্যতীত অন্য আর কিছু চিন্তা করে না ! ইহাদের মধ্যে 'দয়া' বলিয়া কোন গুণ নাই ; দরিদ্রকে ইহারা এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেও কাতর হয়। নিজের ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন অন্য কোন

৬। স্থূল ও জড় দেহই আত্মা—এই তত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন।

৭। মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই—এই মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা 'অজ্ঞেয়বাদী'

উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শ ইহাদের নাই। ইহারা স্থূলদেহকেই আত্মা বলিয়া জানে; স্থূল দেহের অতীত আর কোন বস্তুর অস্তিত্ব ইহারা স্বীকার করে না। আধুনিক আসুরিক প্রকৃতির মনুষ্যেরাও ভগবানের উদ্দেশ্যে কোন সৎকর্ম করেন না। ইঁহারা জীবিত বা মৃত দেহটিকে বিচিত্র বেশভূষায় ও গন্ধ-পুষ্পাদিতে সজ্জিত করেন। ইঁহাদের ধারণা যে, দেহের এইরূপ পরিচর্য্যা করিয়াই মাত্র সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে পারা যায়।

সে যাহাহউক, এদিকে সুরপতি ইন্দ্রের বুদ্ধি বিরোচন অপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম ছিল। তিনিও নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু তিনি যে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাহা দেবগণের মধ্যে প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, আত্মস্বরূপের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জন্ম, মৃত্যু, শোক কিছুই নাই এবং তিনি নিত্য বস্তু। এই অমূল্য বাক্য স্মরণ করিয়া ইন্দ্র মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন "তাহা হইলে এই স্থূল দেহ তো কখনও আত্মা হইতে পারে না। কারণ এই দেহ পরিবর্তনশীল; ইহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সমস্ত বিকারই আছে। যখন এই দেহ জন্ম, জরা ও মৃত্যুর অধীন তখন আচার্যদেব কি করিয়া এই জড় ও স্থূল দেহের প্রতিবিম্বকেই আত্মা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন? আমি তো এই উপদেশের কোনই সার্থকতা দেখি না!" এই-রূপে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র শিষ্যের ন্যায় পূজোপহার হস্তে লইয়া পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতিও তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তুমি সত্যস্বরূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিয়াছ এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছ এইরূপ ধারণা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে বিরোচনের সহিত চলিয়া গিয়াছিলে, এক্ষণে তোমার প্রত্যাবর্তনের কারণ কি?" ইন্দ্র

বিনীতভাবে উত্তর করিলেন: "ভগবন্, যখন এই স্থূল দেহের পরিবর্তনের বিরাম নাই তখন এই দেহের প্রতিবিম্বটি কি করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ হইতে পারে? যদি স্থূল দেহকে বেশভূষা ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সজ্জিত করা যায় তাহা হইলে ছায়ারূপী স্বরূপের আকৃতিও ভিন্ন হইয়া যায়। চক্ষুদ্বয় নষ্ট হইলে দেহের প্রতিবিম্বরূপী আত্মাও তাহা হইলে অন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; আবার দেহটি খঞ্জ হইলে প্রতিবিম্বরূপী আত্মাও খঞ্জ দেখাইবে। দেহটি বিকলাঙ্গ হইলে আত্মাও বিকলাঙ্গ দেখাইবে এবং সর্বশেষে দেখিতেছি যে, দেহের নাশ হইলে আত্মারও নাশ হইয়া যাইবে; সুতরাং পরিবর্তনশীল দেহের প্রতিবিম্বটি কখনই আত্মা হইতে পারে না। আমিও এই শিক্ষার কোন সার্থকতা দেখিতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার সংশয় দূর করিয়া দিন এবং যাহাতে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ আমি বুঝিতে পারি সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করুন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া আচার্য প্রজাপতি উত্তর করিলেন: "ইন্দ্র, তুমি যাহা বলিলে তাহা যুক্তিসঙ্গত। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমি ব্যাখ্যা করিব। তুমি আমার নিকট শিষ্যরূপে আরও বত্রিশ বৎসরকাল বাস কর।"

ইন্দ্র গুরুসেবাপরায়ণ হইয়া তথায় আরও বত্রিশ বৎসর-কাল যাপন করিলেন। ইন্দ্রের পবিত্রতা, ব্রহ্মচর্য ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া প্রজাপতি একদিন তাঁহাকে বলিলেন: "যিনি নিদ্রাকালে বহুবিধ স্বপ্নবিষয় ভোগ করেন তিনিই আত্মা, তিনিই অমৃত ও ভয়হীন ব্রহ্ম। ইহাকে উপলব্ধি কর, ইহার অনুভূতি লাভ কর।"[৮] এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে প্রস্থান

৮। য এষ স্বপ্নে মহীয়মানশ্চরত্যেষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি।—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১০।১

করিলেন। কিন্তু অন্যান্য দেবতাগণকে এই সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে তিনি পুনরায় দেখিলেন যে, আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার তখনও সন্দেহ রহিয়াছে। তিনি চিন্তা করিয়া বুঝিলেন যে, দেহের ছায়া বা প্রতিবিম্ব এবং স্বপ্নবিষয় যিনি ভোগ করেন সেই শুদ্ধ আত্মা ও দেহ এক নয়; কারণ বাহ্য আকারের পরিবর্তন হইলে তো শুদ্ধ আত্মার কোনও পরিবর্তন হয় না? যদি দেহটি চক্ষুহীন হয়, কই শুদ্ধ-আত্মা তো অন্ধ হন না? দেহ খঞ্জ হইলে অথবা দেহের কোনও প্রকার অনিষ্ট হইলে শুদ্ধ আত্মা তো কই খঞ্জ বা তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় না? সুতরাং স্থূল শরীরের দোষে বা বিকারে এই স্বপ্নদ্রষ্টা শুদ্ধ-আত্মা কখনই দূষিত বা বিকৃত হন না। তাহার পর দেহস্থিত যে পুরুষ স্বপ্নজাত বিষয়সমূহ ভোগ করেন, তিনিই বা কিরূপে অপরিবর্তনশীল আত্মা হইতে পারেন, কেননা তাঁহাকেও তো দুঃখদায়ক স্বপ্ন প্রভৃতি দর্শন করিয়া যন্ত্রণাদি ভোগ করিতে হয় এবং স্থূল দেহের মতন তাঁহাকেও তো নানাপ্রকার পরিবর্তন ও ভয়ের অধীন হইয়া থাকিতে হয়? এইরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া ইন্দ্র বলিলেনঃ "আমি এই উপদেশে কোনই সুফল দেখিতেছি না। আবার আমি গুরুদেবের নিকট যাইব এবং তাঁহাকে এই সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিব।" এই বলিয়া পূর্বের ন্যায় ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট তৃতীয়বার উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "ভগবন্, আপনার মুখে শুনিয়াছিলাম যে, আত্মা অপরিবর্তনশীল, অমর এবং জন্ম, জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি বর্জিত; কিন্তু তাহা হইলে স্বপ্নদর্শী পুরুষ কিরূপে আত্মা হইতে পারেন?" ইহা শ্রবণ করিয়া আচার্য প্রজাপতি বলিলেনঃ "ইন্দ্র, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। আত্মা সম্বন্ধে আমি তোমায়

পুনরায় উপদেশ প্রদান করিব, তুমি আমার নিকট আরও বত্রিশ বৎসর বাস কর।"

পুনরায় এই নির্দিষ্ট বত্রিশ বৎসর অতীত হইয়া গেলে প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন: "গভীর নিদ্রাবস্থায় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি সাক্ষী স্বরূপ শান্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি সেই সময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারশূন্য আর কোনও স্বপ্নাদি দর্শন করেন না, তিনিই সেই মৃত্যুহীন অজর অমর আত্মা।" ইন্দ্র এইপ্রকার কথা শ্রবণ করিয়া শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবতাদিগের নিকট যাইবার পূর্বে তাঁহার পূর্বেকার ন্যায়ই আবার সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি বলিলেন: "যখন 'আমি ও আমার'-রূপ 'অহং'-জ্ঞানই সুষুপ্তিতে থাকে না তখন এই শান্ত অবস্থাই কিরূপে আত্মা হইতে পারে? সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও প্রকার বাহ্যজ্ঞান না থাকিলে আচার্য-দেব কি সর্বপ্রকার চিন্তা, অনুভূতি এবং জ্ঞানের শূন্যাবস্থাকেই 'আত্মা' বলিয়াছেন?" বাস্তবিক সুষুপ্তির অবস্থায় আমাদের কোনও প্রকার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন আমরা স্বপ্নাদিও দর্শন করি না, তখন মনের মধ্যে সুখ-দুঃখাদি ভাবের অনুভূতি ও কেবল অহং-জ্ঞান থাকে, কোন ইন্দ্রিয়ের কার্যও থাকে না। এইপ্রকার শূন্যবস্থা আত্মা কিরূপে হইতে পারেন তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া সমিৎপাণি হইয়া ইন্দ্র পুনরায় প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ইন্দ্রকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন—পুনরায় আসিবার কারণ কি? ইন্দ্র বলিলেন: "অহং-জ্ঞানশূন্য, বাহ্যজ্ঞান এবং বিষয়ানুভূতি-রহিত অবস্থাকেই কি আপনি 'আত্মা' বলিয়াছেন?" প্রজাপতি উত্তর করিলেন: "না, তাহা নহে।" এইস্থানে আমরা বুঝিতে পারি যে, বিচক্ষণ আচার্যগণ কিরূপে তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে স্থূল হইতে

আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর রাজ্যে ক্রমশঃ লইয়া যাইয়া সর্বশেষে সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ প্রদান করেন।

আমরা যদি চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবরাজ্যের উপরে সুষুপ্তির অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া আরও উপরে অগ্রসর হইতে পারি তাহা হইলেই আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে। প্রজাপতি ইন্দ্রের পুনরাগমনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন: "তুমি বুদ্ধিমান্, আমি তোমাকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে আরও কিছু বলিব। তুমি আমার নিকট আরও পাঁচ বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বাস কর।"

ইন্দ্র তাহাই করিলেন এবং সেই পাঁচ বৎসর অতীত হইলে প্রজাপতি ইন্দ্রকে উচ্চতম জ্ঞান প্রদান করিলেন। ইন্দ্রও চিন্তা করিলেন যে, এই দৃশ্যমান স্থূল শরীর 'আত্মা' হইতে পারে না ; ইহা মরণশীল, বস্তুতঃ ইহা সর্বদা মৃত্যুগ্রস্ত।[৯] এই দেহ যতদিন থাকে ততদিন ইহা প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হয়। দেহের প্রত্যেক পরমাণুর অবিরাম পরিবর্তন হইতেছে এবং এই পরিবর্তনক্রিয়া যদি অল্প সময়ের জন্য বন্ধ হয় তাহা হইলে দেহের বিনাশ হইবে। এই শরীরের সর্বদাই মৃত্যু হইতেছে ; সর্বদাই ইহার মধ্যে মৃত্যুর ক্রিয়া চলিতেছে। এইস্থলে 'শরীর' শব্দে ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত শরীর বুঝিতে হইবে। এই শরীরই আত্মার আবাসস্থান বা যন্ত্রস্বরূপ : কিন্তু আত্মা দেহ রহিত ও অমর। এই দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যে আত্মা পার্থিব জগতের সংস্পর্শে আসেন মাত্র। যদি আত্মা এই স্থূল শরীর নির্মাণ না

৯। মঘবন্ মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা তদস্যামৃতস্যাশরীরস্যা-ত্মনোঽধিষ্ঠানমাত্তো বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।
—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১২।১

করিতেন তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদেব ভোগ করিতে পারিতেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আত্মার ভোগের জন্যই এই শরীরের সৃষ্টি এবং স্থায়িত্ব। আত্মা দেহেতে অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়াই জীব দেহাভিমানী হইয়া থাকে এবং 'আমার এই শরীর' ইত্যাকার ধারণা কবিয়া সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি অনুভব করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শরীর কিছুই অনুভব করে না। আত্মাই দেহেব কর্তা ও অধিপতি; শরীরটি তাঁহার বাসগৃহ মাত্র।

যিনি ইন্দ্রিয়সকলকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া বাহ্যবিষয়-সমূহ গ্রহণ কবেন তিনিই আমাদেব অন্তরস্থ আত্মা। ইন্দ্রিয়-যন্ত্রগুলিব সহিত বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ হইলেই ইন্দ্রিয়-বিষয়ের অনুভূতি হইযা থাকে। যতক্ষণ আত্মা দেহরূপ স্থূল আকারের মধ্য দিয়া প্রকাশিত না হন ততক্ষণ স্থূল বাহ্যবস্তুগুলি আকার-বিশিষ্ট বলিয়া সাক্ষাৎভাবে আত্মার সংস্পর্শে আসিতে পারে না। কিন্তু এই দেহেব জ্ঞাতা, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিষয়ানুভূতির ভোগকর্তা এবং যাবতীয় কার্যের কর্তা সেই আত্মা স্বভাবতঃই অরূপ অর্থাৎ তাঁহাব কোনও আকাব নাই। প্রজাপতি ইন্দ্রকে সেইজন্য বলিলেন: "আত্মার বিশেষ কোনও প্রকার আকার নাই। আত্মা দেহেব মধ্যে কোনও প্রকাব আকারবিশিষ্ট না হইয়া বিবাজ কবেন।" এক্ষণে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদেব দেহেব আকাব থাকিলেও আত্মার কোনই আকার নাই এবং ইহা অনুভব করিলেই দেহের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মাব যে কোনও পবিবর্তন হয় না—এই কথা আমরা বুঝিতে পারিব। সুতবাং আত্মা যদি অরূপ হন তাহা হইলে দেহের ছায়া বা প্রতিবিম্ব কিরূপে আত্মা হইতে পারে? অসুররাজ

বিরোচনের বুদ্ধি তমোগুণে আবৃত ও তাঁহার মন অপবিত্র ছিল এবং সেজন্যই তিনি আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। তিনি যদি পরে ঐ বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করিতেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রজাপতি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেন এবং সেজন্যই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু বিরোচন আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সমস্তই অবগত হইয়াছেন এই মনে করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি জ্ঞানলাভের যোগ্য পাত্র নহেন এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ও স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া বিরোচনকে জ্ঞান দান করিতে উৎসুক হন নাই। আর এই কারণেই বিরোচনও সেই অরূপ ও অমর আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

যাবতীয় ইন্দ্রিয়, সর্বপ্রকার ঐন্দ্রিয়িক বিষয়ের অনুভূতি এবং দেহ সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ই ক্ষণস্থায়ী। আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিলে অবিনশ্বর আত্মা ও বিনশ্বর দেহ যে এক নহে তাহা বুঝিতে পারিব। কিছুকালের জন্য এই নাম-রূপহীন আত্মা দেহের মধ্যে বাস করেন এবং ইহা পরিত্যাগ করিবার পরেও দেহরূপ আকারের অতীত হইয়াই থাকেন। যতক্ষণ এই আত্মা কাহারও দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন ও সেই দেহধর্মযুক্ত হন ততক্ষণই আত্মা সুখ ও দুঃখ-ভোগ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি এই নির্লিপ্ত আত্মাকে দেহ হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত দেখেন, তাঁহার আর সুখ ও দুঃখ বোধ থাকে না।

এখানে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, নাম-রূপহীন আত্মা কিরূপে আকারবিশিষ্ট দেহের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে পারেন? ইন্দ্রেরও এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা দূর করিবার

জন্যই প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন[১০] : "কিন্তু আমরা জানি যে, বায়ুব কোনও রূপ বা আকার নাই, বাষ্পেরও কোন আকার নাই, তড়িৎশক্তিরও কোনও আকার নাই, কিন্তু ইহারা অন্য কোন আকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশমান হয়।" যদিও বায়ুর কোনও আকার নাই তথাপি বায়ু যখন বহিতে থাকে তখন ইহা আকার-বিশিষ্ট বস্তুগুলির সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের সঞ্চালন করে এবং তাহার দ্বারাই বায়ুর আকার ও ক্ষমতা প্রকাশিত হয়। এইরূপ বাষ্পও আকারশূন্য, কিন্তু বাষ্পীয় যানের দ্বারা আমরা ইহার বিশাল শক্তির প্রকাশ দেখিয়া থাকি। আমাদের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল (atmosphere) তড়িৎশক্তিতে পরিপূর্ণ হইলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু বিদ্যুতের দীপ্তি বা বজ্রপাত ইত্যাদিতে উহার অস্তিত্বের পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। আমরা বাস্তবিক এই বায়ুমণ্ডলস্থিত তড়িৎ-শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করি না। মার্কনি (Merconi) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের জন্যই তড়িৎ-প্রবাহের উপকারিতা আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। বেতারবার্তাতেও এই প্রকার তড়িৎ-শক্তির আমরা পরিচয় পাইয়া থাকি। বাস্তবিক কেহ কখনও কোন অরূপ শক্তিকে চক্ষুদ্বারা দর্শন বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করেন নাই, তবে

১০। (ক) "অশরীরো বায়ুরভ্রং বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুরশরীরাণ্যেতানি, তদ্ যথৈতান্যমুষ্মাদাকাশাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যন্তে ॥ —ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১২।২

(খ) এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপ-সম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিস্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমেবায়মস্মিঞ্ছরীরে প্রাণো যুক্তঃ ॥ ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১২।৩

ইহাদের অস্তিত্ব কোনও আকারের (পদার্থের) উপর প্রকাশিত হইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যেমন অবস্থাবিশেষে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অরূপ শক্তিসমূহকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় সেইরূপ এই আত্মা স্বভাবতঃ অতীন্দ্রিয় হইলেও স্থূলদেহের মধ্য দিয়াই ইহার ক্ষমতা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যে চিন্তারূপে প্রকাশিত না হইলে আত্মার যে চিন্তাশক্তি আছে তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এইপ্রকারে আত্মার দর্শনশক্তি ও অনুভবশক্তির অস্তিত্ব উহাদের বহিঃপ্রকাশের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। যদি কোনও ব্যক্তির দর্শনশক্তির প্রকাশ না থাকে তাহা হইলে আমরা তাহাকে 'অন্ধ' বলিয়া থাকি। যাহার মানসিকশক্তি ও বোধশক্তি সুপ্তভাবে থাকে তাহাকে আমরা 'মূঢ়' বলিয়া থাকি; কিন্তু যখনই এই সমস্ত শক্তি ব্যক্ত বা প্রকাশমান হয় তখনই আমরা ইহাদের কার্য দেখিতে পাই। যদি দেহের মধ্য দিয়া দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, আস্বাদনশক্তি, স্পর্শশক্তি, চিন্তাশক্তি ইত্যাদির প্রকাশ দেখা না যাইত তাহা হইলে জীবাত্মার অন্তরে নিহিত ঐ সকল শক্তিসম্বন্ধে আমরা কিছুই অনুমান করিতে পারিতাম না। ঐ শক্তিগুলি আমাদের অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা হইতেই উৎপন্ন হয়। অবিদ্যাবশতঃ এবং দেহাত্মভ্রমের জন্য আমরা মনে করি যে, ঐ সমস্ত শক্তি দেহ হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু যখন আত্মজ্ঞানরূপ সূর্যের উদয় হয় তখন অজ্ঞানের সমস্ত অন্ধকার দূরে চলিয়া যায় এবং সর্বশক্তিসম্পন্ন চৈতন্যময় আত্মা দেহ হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হন। যেমন কোন মূঢ় ব্যক্তি আকাশ হইতে বায়ু, মেঘ এবং তড়িৎশক্তির পার্থক্য দেখিতে পায় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরহিত মূঢ় ব্যক্তিও আত্মাকে স্থূল ইন্দ্রিয়যন্ত্রগুলি

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌রূপে দেখিতে পায় না। যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই ইহা উপলব্ধি করেন যে, আত্মাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই সুখী এবং সেজন্য তিনি স্থূলদেহের সুখ-দুঃখাদি চিন্তা না করিয়া খেলাধূলার মতনই পার্থিব জীবনের সকল অবস্থাকে উপভোগ করেন। তিনি তাঁহার স্থূলদেহকে চৈতন্যস্বরূপ আত্মার আবাস স্থান বলিয়াই জানেন, স্থূল দেহে কখনও আসক্ত হন না। আমরা পূর্বেই বিচার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মাতে প্রজ্ঞা আছে এবং প্রাণশক্তি আছে। এই প্রজ্ঞা ও প্রাণশক্তি পরিদৃশ্যমান বাহ্যজগতের অধিষ্ঠানরূপে বর্তমান। যখন এই 'প্রজ্ঞা' ও 'প্রাণ' সুপ্তভাবে থাকে তখন বাহ্যজগতের কোনও প্রকার ক্রমবিকাশ হয় না। ব্যাপক হউক, বা আণবিকই হউক, জগতে যতপ্রকার কম্পন আছে এবং যতপ্রকার গতি আমরা অবগত আছি তাহা প্রাণশক্তির ক্রিয়া বা বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। প্রজ্ঞার প্রকাশ মনুষ্যজাতির মধ্যে—এমনকি ইতরপ্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়। স্বরূপতঃ এই প্রজ্ঞার আবার কোনও ভেদ নাই, তবে প্রভেদ কেবল আধার অনুযায়ী বিকাশের মাত্রাতেই। যেখানেই প্রজ্ঞার বিকাশ, জীবনীশক্তির ক্রিয়া অথবা অন্য কোনও প্রকার শক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সেখানেই আত্মার প্রকাশ আছে ইহা বুঝিতে হইবে। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে কোন-প্রকার জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। প্রথমে 'আমি আছি' এই প্রকার অস্তিত্বের জ্ঞান না থাকিলে কাহারও অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না। বুদ্ধির মলিনতাবশতঃ আমরা আমাদের আত্মার যথার্থ স্বরূপকে জানিতে না পারিলেও প্রজ্ঞার বিকাশ কিন্তু আমাদের ভিতর থাকিবেই। বেদান্তদর্শন বলে যে,

যদি আমরা এই পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎকে অনবরত বিশ্লেষণ করিয়া ইহার কারণকে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলে আমরা পরিশেষে দুইটি মূলতত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারিব: তাহাদের একটি 'প্রজ্ঞা' এবং অপরটি 'প্রাণ'। এই প্রাণ ও প্রজ্ঞা বিশুদ্ধ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং সেই বিরাট-পুরুষ ব্রহ্মই সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির ক্রিয়ার আধার ও উৎপত্তি স্থান।[১১]

প্রজাপতি সেজন্য ইন্দ্রকে বলিলেন: "আত্মাই নিখিল বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবস্তু।" যথার্থ-উপলব্ধি বা জ্ঞান না হইলে আমরা আমাদের ব্যষ্টিস্বরূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিতে পারি না, কারণ এই নিখিল বিশ্বে এক আত্মাই সচ্চিদানন্দ-সমুদ্ররূপে বিরাজমান এবং ইহাকেই ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরমাত্মা ইত্যাদি বিচিত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম যখন আমাদের পাঞ্চভৌতিক শরীরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হন তখন ব্যষ্টিভাবে উহা আমাদের ব্যক্তিগত আত্মা বা 'জীবাত্মা' বলিয়া অভিহিত হন এবং এই আত্মাই আমাদের প্রজ্ঞা, বুদ্ধি এবং যাবতীয় দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়ার মূলে বর্তমান।

১১। প্রকৃতপক্ষে এই ব্রহ্মচৈতন্য নির্গুণ-ব্রহ্ম নন, কেননা নির্গুণ ব্রহ্মে কোনরূপ মায়া, সৃষ্টি বা দ্বিতীয়ের কল্পনা হইতে পারে না। যেখানেই দ্বিতীয়ের বা সৃষ্টির কল্পনা হইবে সেখানেই বুঝিতে হইবে তিনি গুণযুক্ত—মায়াকে অবলম্বন করিয়া বিশিষ্ট হইয়াছেন। প্রাণ হিরণ্যগর্ভ এবং প্রজ্ঞা ঈশ্বর বা অব্যক্ত। সুতরাং প্রাণ ও প্রজ্ঞার অধিষ্ঠানরূপে শুদ্ধব্রহ্ম কল্পিত হইলেও যেখানে উৎপত্তি বা সৃষ্টির কথা বুঝিতে হইবে সেখানে মায়াবিশিষ্ট (মায়োপহিত) ব্রহ্মই হইবেন—শুদ্ধ এবং তুরীয় ব্রহ্ম নন, তবে শুদ্ধব্রহ্ম উপলক্ষিত হইবেন মাত্র।

বাসনাসমূহ আমাদের মনের বা মানসিক ক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন আকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যদি সর্ববিধ ক্রিয়ার মূলে প্রজ্ঞা অর্থাৎ 'অহং'-জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে বাসনাগুলি আমাদের অন্তরে উদিত হইতে পারিত না। এমন কি তাহাদের অস্তিত্বও থাকিত না। যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি এই জীবদ্দশায়ই সর্বপ্রকার কার্য করিয়াও কেবল আনন্দ সত্তায় অবস্থিত থাকিতে পারেন এবং অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পতিত হইলে কখনও উত্তেজিত বা বিচলিত হন না। পরিদৃশ্যমান জাগতিক পরিবর্তনে জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী পুরুষ কখনও বিক্ষুব্ধ হন না। যেমন গাড়ীতে অশ্ব সংযোজিত হইলে উহা চলিতে থাকে সেইরূপ প্রজ্ঞাজীবও দেহরূপ রথে সংযোজিত হইয়া প্রাণ ও প্রজ্ঞারূপ শক্তি দ্বারা যাবতীয় কার্য করিতেছেন। অথবা এই দেহটিকে যদি আমরা একটি মোটর গাড়ীর সহিত তুলনা করি তাহা হইলে বুঝিতে পারিব মোটর গাড়িটী যেমন বিদ্যুতাধার যন্ত্র (dynamo) হইতে উদ্ভূত তড়িৎশক্তির বলে চলিয়া থাকে সেইরূপ আত্মা হইতে প্রেরিত প্রাণশক্তির দ্বারা এই দেহ সমস্ত কার্য করিয়া থাকে। যদি আত্মা ইন্দ্রিয়গুলিতে সংযুক্ত না থাকেন তাহা হইলে চক্ষু কিছুই দর্শন করিবে না, কর্ণ কিছুই শ্রবণ করিবে না, নাসিকা কিছুই আঘ্রাণ করিবে না, জিহ্বা কিছুই আস্বাদন করিবে না এবং হস্ত-পদাদিও কোনই কার্য করিবে না। এজন্য ইন্দ্রকে প্রজাপতি আরও বলিলেন[১২]: "চক্ষুরূপ ইন্দ্রিয়টি কেবল

১২। অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষণ্নং চক্ষুঃ স চাক্ষুষঃ
পুরুষো দর্শনায় চক্ষুরথ যো বেদেদং জিঘ্রাণীতি
স আত্মা গন্ধায় ঘ্রাণমথ যো বেদেদমভিব্যাহরাণীতি
স আত্মাঽভিব্যাহারায় বাগথ যো বেদেদং শৃণবানীতি
স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ॥—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১২।৪

একটি যন্ত্র মাত্র প্রকৃত দ্রষ্টা চক্ষুর তারকার পশ্চাতে অবস্থান করেন। এই দ্রষ্টা ও যিনি দৃষ্ট-বস্তুর জ্ঞাতা একমাত্র তিনিই আত্মা। নাসিকাদ্বয়ও ঐরূপ যন্ত্র মাত্র; আঘ্রাণকর্তাও আত্মা ও জীবের প্রকৃত স্বরূপ। জিহ্বা শুধু আস্বাদন ও বাক্শক্তির যন্ত্র, কিন্তু যাহা বলা যায় তাহা যিনি উচ্চারণ করাইতেছেন এবং তাহার বিষয় যিনি জানিতেছেন তিনিই অন্তরস্থিত চৈতন্যময় পুরুষ বা আত্মা। কর্ণেন্দ্রিয় শ্রবণশক্তির যন্ত্র মাত্র, কিন্তু শ্রবণকর্তা হইতেছেন আত্মা।"[১৩] "যিনি চিন্তা করিয়া থাকেন তিনিই আত্মা এবং মন তাঁহার আধ্যাত্মিক চক্ষুস্বরূপ। এই মনশ্চক্ষু দ্বারাই আত্মা যাবতীয় প্রিয় বস্তুকে দেখেন এবং আনন্দ উপভোগ করেন। জীবের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা মানসিক ক্রিয়াসমূহেরও জ্ঞাতা এবং মন, বুদ্ধি ও চিত্ত তাঁহার যন্ত্র মাত্র।"[১৪]

স্বর্গলোকে যে সকল দেবতাগণ বাস করেন তাঁহারা এই আত্মার উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থাকেন। সেজন্য সমস্ত পৃথিবী ও স্বর্গাদি লোক দেবতাদের হস্তগত এবং সমস্ত কার্য তাঁহাদের আয়ত্তাধীন। যিনি এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার কোন বিষয়ই সেই সুরলোকবাসী দেবতাদের ন্যায় করায়ত্ত হইতে বাকী থাকে না। তিনিও দেবতাদিগের ন্যায় ত্রিজগতের অধিপতি হন। তাঁহার কোন বাসনাই অপূর্ণ থাকে না এবং এমন কোনও বাসনা নাই যাহা

১৩। অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা, মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে॥

—ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১২।২৫

১৪। য এতে ব্রহ্মলোকে তং বা এতং দেবা আত্মানমুপাসতে তস্মাৎ তেষাং সর্বে চ লোকা আত্মাঃ সর্বে চ কামাঃ স সর্বাংশ্চ

তাঁহার অপরিপূর্ণ থাকিতে পারে। তিনি বাহ্য জগৎ ও সংসার হইতে কোনপ্রকার সুখলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, সর্বপ্রকার ক্ষমতাই তাঁহার মধ্যে থাকে। এক কথায় তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও আনন্দময় সত্তায় বিরাজ করেন।[১৪] এইরূপে প্রজাপতি জীবের প্রকৃত স্বরূপ এবং আত্মার গূঢ়তত্ত্ব ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং পবিত্রচেতা, আগ্রহবান ও উপযুক্ত শিষ্য ইন্দ্রও গুরুর আশীর্বাদে প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ইন্দ্র একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া তাঁহার আচার্য প্রজাপতির সেবা করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মজ্ঞান লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবসায়, আগ্রহ এবং অপ্রতিহত ইচ্ছাই আত্মজ্ঞান লাভের সোপানস্বরূপ।

ইন্দ্র পরমানন্দ লাভ করিয়া অবশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিলেন এবং নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞান দেবতা-গণকেও দান করিলেন। দেবতারাও ইন্দ্রের উপদেশ পালন করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত জগতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এইরূপেই আত্মজ্ঞানের শক্তি ও মহিমা ছান্দোগ্য-উপনিষদে বর্ণিত আছে।

লোকানাপ্নোতি সর্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য জানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ প্রজাপতিরুবাচ ॥ —ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮।১২।৬

ওঁ সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

গুরু ও শিষ্য আমাদের উভয়কে পরমাত্মা রক্ষা ও পালন করুন। আত্মতত্ত্বের জ্ঞানরূপ অমৃতের দ্বারা আমাদের পরিপুষ্টি সাধিত হউক। গুরু যেন আমাদিগকে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করেন। আমাদের শাস্ত্র-অধ্যয়ন যেন পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে পরিণতি লাভ করে। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যেন কোনও বিদ্বেষ না থাকে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

।। আত্মসাক্ষাৎকার ।।

বৈদিকযুগে কোন আত্মজ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তি জীবনের সকল কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার মনে শান্তি আসিতেছে না। তিনি সমস্ত দেবতার পূজা ও সেবাতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; কিন্তু কী আশ্চর্য, তথাপি তাঁহার তো আত্মজ্ঞান লাভ হইল না। জীবনের অধিকাংশ সময়ে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসকল ও পার্থিব সম্বন্ধের দ্বারা শান্তি ও জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব এবং এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্য জগতের সমস্ত বস্তুই অনিত্য, তখন তিনি পার্থিব ভোগসুখাদিতে বীতস্পৃহ হইলেন এবং জাগতিক সমস্ত পদার্থের উপর আসক্তি ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর তিনি শাস্ত্র-অধ্যয়নের কার্যও ত্যাগ করিলেন, কারণ তিনি বুঝিয়া দেখিলেন যে, শাস্ত্রপাঠে আত্মজ্ঞান কিম্বা শাশ্বত সুখ লাভ করা যায় না। ধর্মপুস্তক ও শাস্ত্রসমূহ উচ্চ হইতে উচ্চতর ব্যবহারিক সত্যসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় মাত্র। কিন্তু উহাদের দ্বারা মানুষ সর্বোচ্চ সত্যস্বরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা মনে করেন শুধু ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র-অধ্যয়নের দ্বারাই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করা যায় তাঁহারা ভ্রান্ত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ভগবৎপ্রেম, মুক্তির অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বর্ণিত আছে মাত্র; কিন্তু যেমন পঞ্জিকার মধ্যে সমস্ত বৎসরের বারিবর্ষণের পরিমাণ লিখিত থাকিলেও উহাকে নিংড়াইলে একবিন্দুও জল পাওয়া যায়

না সেইরূপ সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থকে মন্থন করিলেও আধ্যাত্মিক সত্যসকলের বিন্দুমাত্রও উপলব্ধি হয় না। সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত তত্ত্বের অর্থ জানিতে হইলে প্রথমে উহাতে বর্ণিত সত্যের উপলব্ধি করিতে হইবে।

এই কারণেই পূর্বে কথিত সেই ব্যক্তি শাস্ত্র-অধ্যয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে কোন এক আত্মজ্ঞানবান্ গুরুর নিকট শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গমন করিলেন। সুতরাং তাঁহার আর অন্য কোনও প্রকার বাসনা ছিল না, এমন কি তিনি স্বর্গে যাইতেও চাহেন না, আত্মজ্ঞান লাভ করাই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন তিনি অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট বা সুখী হইবেন না। যে দিব্যজ্ঞানরূপ অমৃতধারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের মধ্যে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হয় সেই অমৃতধারা আস্বাদন করিতে এখন তিনি উৎসুক। এই স্থূল নশ্বর দেহটিই জীবের সমগ্র সত্তা নয় এবং ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রনকারী মনও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল, সুতরাং তাহারা কেহই অবিকারী ও অপরিণামী আত্মা হইতে পারে না। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের দ্বারা ইহা অবগত হইলেও তবুও তাঁহার আত্মজ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। এক্ষণে সেই অপরি-বর্তনশীল ও নির্বিশেষে পরমসত্যের, অর্থাৎ আত্মার আত্মা এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরের একমাত্র শাস্তা ও নিয়ন্তার অনুসন্ধানে তিনি ব্যগ্র হইয়াছিলেন। এজন্য একান্ত ভক্তির সহিত ব্রহ্মবিদ্ সদ্‌গুরুর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: "ভগবন্, কে এই মনকে শাসন করিতেছে? কোন্ শক্তির প্রেরণায় মন আপনার যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করিতেছে? কাহার শক্তি আমাদের দেহের মধ্যে অবস্থিত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তিগুলিকে নিয়মিতভাবে চালাইতেছে? কি কারণে

আমরা এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হই এবং এই কর্মপ্রবৃত্তির কারণই বা কি ? কাহার ইচ্ছায় সমস্ত মানব বাক্য উচ্চারণে সমর্থ হইতেছে ? এই দৃশ্যসমূহের দ্রষ্টাই বা কে ? কোন্ শক্তি চক্ষু, কর্ণ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ কর্মে নিয়োজিত করিতেছে ?"[১]

এই প্রশ্নগুলির অবতারণা করিয়া কেনোপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে। লিখিবার কলাকৌশল উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হইবার বহুশতাব্দী পূর্বে ভারতবাসীদের মধ্যে বহুদিন ধরিয়া মুখে মুখে এই উপনিষদের শিক্ষা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, এই উপনিষৎ কত সুপ্রাচীন এবং ইহার উপদেশসমূহও কত মহান্! সেই প্রাচীন যুগের প্রশ্নগুলির ভিতরে ভাবের গাম্ভীর্য ও গভীরতা একবার ভাবিয়া দেখুন। আমরা জানি যে, আমাদের মন সর্বদা চঞ্চল ; এই মুহূর্তে নূতন ভাব চিন্তা মনে উদিত হইতেছে, আবার ঠিক তাহার পরমুহূর্তেই উহা কোথায় লীন হইতেছে। মন অবিরত একস্থান হইতে অন্যস্থানে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ইহা কখনও ভারতবর্ষে, কখনও ইংলাণ্ডে, আবার কখনও চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র এবং অন্যান্য গ্রহমণ্ডলে ছুটিয়া চলিতেছে। এইজন্যই শিষ্যটি গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ "কাহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া মন অবিরাম চঞ্চলভাবে ছুটিয়া বেড়ায় ?"[১] ইহার উত্তরে

১। "কেনেষিতং পতিত প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ
প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি, চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো
যুনক্তি ॥"

—কেনোপনিষৎ ১।১

আচার্যদেব বলিলেন ঃ যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, ইন্দ্রিয়যন্ত্রের সমস্ত কার্যের নিয়ন্তা এবং যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তুর দর্শনকর্তা, তিনিই উহা করিয়া থাকেন।"[২] এই উত্তরটির অর্থ কি তাহা এখানে বিশদভাবে দেখা যাক্। 'শ্রবণ করা' —এই বাক্যের দ্বারা আমরা কি বুঝিয়া থাকি? যে শক্তির দ্বারা এই ভাবটি আমাদের অন্তরে জাগরিত হয় তাহাকেই শব্দের দ্বারা বাহিত শ্রবণকার্য বুঝায়, অথবা ইন্দ্রিয়ের যে শক্তি শব্দকম্পনকে পরিচিত করায়, অর্থাৎ কম্পনটির অস্তিত্ব জ্ঞাপন করায় তাহাকেই শ্রবণ-ব্যাপার বলে। সুতরাং যাঁহার সাহায্য ব্যতীত কোনও শব্দই শ্রবণ করা যায় না সেই শ্রবণশক্তির উন্মেষকারী ও উদ্ভাসককে শ্রোত্রের শ্রোত্র বুঝায়। আচার্যের উত্তরের তাৎপর্য বা ভাবার্থ এই যে, যিনি মনের প্রেরণা ও কার্যের নিয়ন্ত্রণকারী তিনিই শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চিন্তা-শক্তি ও বাক্‌শক্তির উদ্ভাসক বা প্রকাশক এবং তিনিই আমাদের ইন্দ্রিয়যন্ত্রাদির সমস্ত কার্যের জ্ঞাতা।

'চক্ষুর চক্ষুস্বরূপ'—ইহার অর্থও ঐ প্রকার। ইন্দ্রিয়ের যে কার্যের দ্বারা দ্রষ্টব্য বস্তু প্রতিভাত হয়, অর্থাৎ আমাদের নিকট বস্তুটি পরিচিতরূপে প্রকাশিত হয় তাহাকেই দর্শন-ক্রিয়ার ব্যাপার বলে। জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপাদন করিতে দর্শনেন্দ্রিয়ের কোনও ক্ষমতা নাই। দর্শনকারী ব্যক্তি যতক্ষণ প্রজ্ঞাচক্ষুসম্পন্ন থাকেন, অর্থাৎ যতক্ষণ তাঁহার 'অহং পশ্যামি' বা 'আমি দর্শন করিতেছি' এইরূপ জ্ঞানটি থাকে ততক্ষণই

২। "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।"
—কেনোপনিষৎ ১।২

দর্শনশক্তিটি তাঁহাতে জাগ্রত থাকে। দর্শনেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি যথা চক্ষু, অক্ষিগোলকের ঝিল্লি (retina), চক্ষুর সমস্ত স্নায়ু, মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ (brain-cells) ইত্যাদি দ্রষ্টব্য বস্তু বা কোনও বর্ণসম্বন্ধে জ্ঞান উৎপাদন করিতে একেবারেই সক্ষম নয়। কোনও মানবের মৃতদেহে পূর্বোক্ত দৈহিক সংস্থানগুলি অবিকৃত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা সত্বেও ঐ দেহ কোনও বর্ণ বা কোনও দৃশ্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবে না। কেবলমাত্র জড় দেহটি স্বাধীনভাবে কোনও বাহ্যবস্তু দেখিতে বা তাহা অনুভব করিতে পারে না। এইরূপে আমাদের অনুভূতিগুলির বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়যন্ত্রের জ্ঞান শক্তিবিহীন ও অচেতন। চৈতন্যময় আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় ক্রিয়ার প্রকাশক ; তিনিই দর্শনকর্তা, শ্রবণকর্তা ও অনুভবের কর্তা। আত্মাই আমাদের অন্তরের মধ্যে চিন্তারাজির উৎপাদক ও কর্তারূপে থাকেন। সেই জ্ঞান ও চৈতন্যের ঘনীভূত প্রকাশরূপ আত্মাই সর্বপ্রকার জ্ঞান ও অনুভূতির মূলস্বরূপ এবং মন ও ইন্দ্রিয়গণের কার্যনিয়ামক। যখনই আমরা প্রজ্ঞা অথবা আত্মচৈতন্যের কারণকে উপলব্ধি করিতে পারিব তখনই মনের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে আমরা বুঝিতে সক্ষম হইব।

স্পন্দন অথবা কম্পনের ফলে সূক্ষ্মতর অবস্থায় পরিণত পরমাণুকেই বেদান্তে 'মন' বলা হয়। মনের এই উপাদানের কম্পন (vibration) হইতেই সর্বপ্রকার বোধশক্তি ও অনুভব করার ক্রিয়া উদ্ভব হইয়া থাকে এবং যে সকল বস্তু স্থূল জড়-পরমাণুর কম্পনের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না—ইহা তাহাদিগকে প্রকাশিত করে। সত্ত্বগুণসম্পন্ন অতিসূক্ষ্ম পরমাণুরাশির কম্পনই মনের যাবতীয় বৃত্তি (function)।

কিন্তু মনের ঐ উপাদানের কম্পনের দ্বারাও জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (চৈতন্য) উৎপন্ন হয় না। বৃত্তি স্বভাবতঃই জ্ঞানশক্তিবিহীন বা অচেতন। একখণ্ড লৌহকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে রাখিলে উহা যেরূপ ঐ অগ্নির মতই জ্বলন্ত লোহিতবর্ণ ও তাহার দাহিকা-শক্তিবিশিষ্ট হয় সেরূপ মন পদার্থটিও চৈতন্যময় আত্মার সংস্পর্শে আসিলে তাহা চেতনধর্মী বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। প্রজ্ঞানঘন আত্মা যেন চুম্বকের মত মনরূপী লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যখন একখণ্ড লৌহকে চুম্বকের নিকট রাখা যায় তখন লৌহখণ্ডটি তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নড়িতে থাকে; কিন্তু বাস্তবিক লৌহের নিজের উক্ত প্রকারে নড়িবার ক্ষমতা নাই; লৌহখণ্ড চুম্বকের নিকট অবস্থান করিলে অথবা উহার সংস্পর্শে আসিলে তাহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই লৌহের গতিশীলতা দেখাইয়া থাকে। চুম্বকের সান্নিধ্যই যেমন লৌহখণ্ডটির মধ্যে গতিশীলতা আনয়ন করে, আত্মার সান্নিধ্যই সেই প্রকারে মনরূপ বস্তুটিকে ক্রিয়াশীল করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আত্মা মনোরাজ্যের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নহে; কারণ, তিনি দেশ ও কালের সর্ব-প্রকার সম্বন্ধের অতীত।

আচার্যদেব বলিতে লাগিলেন: "এই আত্মাকে বিদিত হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীব্যক্তিরা পার্থিব বাসনাদি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সর্বপ্রকার জ্ঞানের অধিষ্ঠান সেই আত্মাকে জ্ঞাত হইয়াছেন তাঁহারাই অমৃতত্ত্ব লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা আত্মাকে জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা স্থূলদেহে এবং ইন্দ্রিয়াদিতেই আসক্ত হইয়া থাকেন এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগকে বারবার জন্ম-মৃত্যুর বশবর্তী হইতে হয়। আমাদের যথার্থ স্বরূপ বা আত্মাকে

জানিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব লাভ করি—ইহা আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন ফলের মধ্যে অন্যতম একটি ফল। যদিও বেদান্ত-দর্শনের মতে আত্মার মৃত্যু নাই এবং অমরত্বই আমাদের জন্মগত অধিকার তথাপি যতদিন না আত্মাকে অবিনাশী বলিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি ততদিন আমাদের ঐ অমৃতত্ব লাভ হয় না। "আমরা বিনাশশীল"—যে পর্যন্ত এই সংস্কার আমাদের মধ্যে থাকে সেই পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু-ভয় থাকিবে। আত্মার অমরত্ব উপলব্ধি করিলেই সমস্ত ভয় চলিয়া যায়। অজ্ঞানতার জন্যই আমাদের মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হয় এবং সেজন্যই আমরা যে অমৃতের সন্তান ও মৃত্যুর অতীত—এই কথা ভুলিয়া যাই, আর সঙ্গে সঙ্গে 'আমরা দেহ ছাড়া আর কিছু নহি' এই সংস্কারের বশবর্তী হইয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়ি। এইরূপ বিনাশশীল ও নশ্বর স্থূল দেহটির সহিত একীভূত হইয়া অথবা দেহের সহিত নিজেকে এক ভাবিয়া আমরা মৃত্যুকে ভয় করিতে থাকি এবং দুঃখে ও নৈরাশ্যে কাতর হইয়া পড়ি। দেহ নশ্বর ও তাহার ধ্বংস অনিবার্য। অতএব আত্মাকে সেই মৃত্যুশীল দেহের সহিত এক বলিয়া বোধ করিলে কিরূপে মৃত্যু-ভয় হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি? এই জড় দেহটি আত্মার ক্ষণিক আবাসস্থল বা আধার—এই ভাবটি যিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহাকে আর মৃত্যু-ভয়ে কাতর হইতে হয় না। যিনি এই মহান্ সত্য যথাযথভাবে জানিয়েছেন যে, আত্মাই কতকগুলি বাসনা ও উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এই দেহযন্ত্রটি নির্মাণ করিয়া থাকেন তিনিই ভয়কে অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন। এই কারণে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেঃ "যাঁহারা আপনাদের যথার্থ স্বরূপের বা আত্মার জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকেই জ্ঞানী বলা যায়

এবং দেহটি ধ্বংস হইলে তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া যান।"৩ এই আপেক্ষিক জগতে ইহাই একমাত্র অভীষ্ট বস্তু।

একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি। এখন আমরা মনে করিতেছি যে, বিষয়-সম্পত্তির ভোগ, ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ, বাসনাচরিতার্থ ও ইন্দ্রিয়-বিলাসই এই জীবনের চরমলক্ষ্য। কিন্তু এমন একদিন আসিবে যখন আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই বিষয়-ঐশ্বর্য প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণস্থায়ী; জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর। অধিকতর স্থায়ী জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন; কারণ মানব-জীবনের উদ্দেশ্য যথার্থভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিনা তাহা বুঝিবার সঠিক আদর্শ এই পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রত্যেককেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যটি কি তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। সেই আদর্শ আত্মজ্ঞান লাভ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আত্মজ্ঞানলাভ হইতেই শাশ্বত মুক্তি লাভ হয়। এই আত্ম-জ্ঞানের দ্বারাই আমরা সমস্ত কাম্য বস্তু বা বিষয়কে প্রাপ্ত হইতে পারি। মানবের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মার জ্ঞানলাভ অপেক্ষা এই জগতে শ্রেষ্ঠতর বস্তু আর নাই। বর্তমানে আমাদের অধিকারে যে পরিমাণ জ্ঞান আছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং ইহা সেই সর্বজ্ঞ শুদ্ধস্বভাব আত্মার আংশিক প্রকাশমাত্র। আমাদের বুদ্ধিতে আত্মা দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর ন্যায় প্রতিবিম্বিত হয়। এই বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ এবং সেইজন্য ইহাতে আত্মার

৩। "—অতিমুচ্য ধীরাঃ,
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥"—কেনোপনিষৎ ১।২

প্রতিফলনও অসম্পূর্ণতার দোষযুক্ত। কিন্তু যখনই সর্বপ্রকার মলিনতা ও অসম্পূর্ণতা চলিয়া যাওয়ার ফলে বুদ্ধি নির্মল হয় তখনই যথার্থ জ্ঞান আমাদের অন্তরের মধ্যে সমুদিত হয়। একটি দর্পণ ধূলিসমাচ্ছন্ন হইলে তাহাতে যেরূপ সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হয় না, বুদ্ধিরূপ দর্পণও সেইরূপ সংসার-বাসনারূপ ধূলিজালে মলিন ও সমাবৃত হইলে দিব্যজ্ঞানের সূর্যরূপ আত্মার আলোকরশ্মি তাহাতে প্রতিভাসিত হয় না। চিত্তকে শুদ্ধ, বুদ্ধিকে নির্মল এবং সেই পরমসত্য সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইলে আমাদের একজন তত্ত্বজ্ঞ ও সিদ্ধগুরুর সাহায্য প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা এক ভিন্ন বহু নহে এবং যে জ্ঞান আমাদের আছে যখন তাহার দ্বারা আমরা জন্ম-মৃত্যুর অতীত আত্মাকে উপলব্ধি করিব তখনই আমাদের এই ক্ষুদ্র জাগতিক জ্ঞানও দিব্যজ্ঞানের অসীমতা লাভ করিবে। অতএব যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এই জীবনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যিনি মনের নিয়ন্তা, দৃশ্যের দ্রষ্টা এবং যাঁহাকে জানিয়া লোকে অমৃতত্ব লাভ করে ঐ শিষ্যটি সেই আত্মার দর্শন লাভ করিতে অভিলাষী হইলেন। তাহাতে তাঁহার গুরুদেব বলিলেনঃ দর্শনশক্তির তো আত্মাকে প্রকাশ করিবার কোনও ক্ষমতা নাই।[৪]

তখন শিষ্যটি চিন্তা করিয়া বলিলেনঃ "যদি চক্ষুর আত্মদর্শন করাইবার ক্ষমতা না থাকে, অন্ততঃ আত্মা কিরূপ, তাহার বর্ণনা তো করা যাইতে পারে?" আচার্য উত্তর করিলেনঃ "বাক্য তাঁহার বিষয় বর্ণনা করিতে পারে না, মনও আত্মার রাজ্যে যাইতে পারে না—'অবাঙ্ মনসোহগোচরম্'।

৪। "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি *।"—কেন ১।৩

সুতরাং আমরা যখন তাঁহাকে মন ও বুদ্ধির সহযোগে জানিতে পারি না তখন কি প্রকারে তাঁহার বিষয় বাক্যের দ্বারা শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া সম্ভবপর হইতে পারে?"[৫] আত্মাই যাবতীয় চিন্তার কর্তা, অথচ চিন্তা রাজ্যের অতীত যে আত্মা তাঁহারই দ্বারা পরিচালিত হইলে মন চিন্তা করিতে পারে। চিন্তা করার কর্ম হইতেই প্রজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অর্থাৎ জ্ঞান বা চৈতন্য যে আছে সেই বিষয়ের আভাস পাওয়া যায় এবং প্রজ্ঞা বা চৈতন্য না থাকিলে কাহারও অন্তরে কোন প্রকার চিন্তারই উদয় হইতে পারে না। সুতরাং যাহা সর্বপ্রকার চিন্তার বাহিরে চিন্তাতীত হইয়া আছে তাহাকে মন ও বুদ্ধি কিছুতেই ধরিতে পারে না।[৬] তাহার পর মনই যখন এই আত্মার বিয়য় চিন্তা করিতে পারে না তখন চক্ষু কি প্রকারে আত্মাকে দেখিতে পাইবে? যাঁহার সংস্পর্শে আসিবার পরে চক্ষুর দর্শন করাইবার ক্ষমতা প্রকাশ পায়, তাঁহাকে দৃষ্টিশক্তি কিরূপে দেখাইতে পারিবে? ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। আচার্য বলিলেন: "আত্মা জ্ঞানের বস্তু হইতে বহু দূরে এবং অজ্ঞাত বস্তুরও বহু উর্ধে— এই উপদেশ আমরা সেই প্রাচীন আচার্য ব্রহ্মের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।"[৭] অতি প্রাচীনকাল হইতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বলিয়া আসিতেছেন যে, আমাদের যথার্থ স্বরূপ আত্মা যেমন জ্ঞাত বা জ্ঞেয় পদার্থ নহেন সেইরূপ আত্মা আবার অজ্ঞাত বা

৫। "যন্মনসা ন মনুতে *।"—কেন ১।৬

৬। "ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ।"—কেন ১।৩

৭। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে —কেন ১।৪॥

অজ্ঞেয়ও নহেন।[৮] সাধারণতঃ আমরা ব্যবহারিক জগতে 'এই বস্তুটি জানি' অথবা 'এই পুস্তক সম্বন্ধে আমার জ্ঞান আছে' এইরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি ; কিন্তু এইপ্রকার জ্ঞানের মত আত্মা সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ আত্মা এইরূপে জ্ঞাত হন না অথবা আত্মা উক্ত পুস্তকটির মতন জ্ঞাতব্য বিষয়ও হইতে পারেন না।

এক্ষণে এই বিষয়টি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুটভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। যখন আমরা বলি যে 'অমুক বস্তুটি আমি জানি', তখন ঐ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত আপেক্ষিক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, অর্থাৎ তখন মাত্র বুদ্ধির দ্বারা আমি ঐ বস্তুটিকে জানিতে পারিলাম। আবার ইহাও হইতে পারে যে, যে বুদ্ধি দিয়া আমি পূর্বে ঐ প্রকার বস্তু জানিতে পারিয়াছিলাম উহা সেই একই প্রকার বস্তু বলিয়া এখনও সেই বুদ্ধি দ্বারা উহাকে আবার জানিতে পারিলাম। এইরূপ জ্ঞানকেই 'আপেক্ষিক জ্ঞান' বলে। আবার যখন বলি যে, 'অমুক বস্তুটি জানি না' তখনও ঐ না-জানিতে পারা-রূপ জ্ঞানটি বুদ্ধি দ্বারা প্রকাশিত আপেক্ষিক জ্ঞান। তাহার পর আবার যে সমস্ত বস্তুর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকে, বা যাহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু তাহাদেরই আমরা বুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারি। এই বুদ্ধি কোন-না-কোনও প্রকারে ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুলির অধীন ; সুতরাং ইহার ক্ষেত্রও অত্যন্ত সীমায়িত। কারণ ইন্দ্রিয়গুলিকে যদি একটি বৃত্তের মধ্যে আছে বলিয়া মনে করি, উহাদের শক্তিগুলি যদি ঐ বৃত্তের পরিধি মনে করি এবং উহাদের শক্তিগুলি যদি ঐ বৃত্তের

৮। হ্যামিল্টন, হার্বার্ট স্পেন্সার ও ইমানুয়েল কাণ্ট আত্মা সম্বন্ধে এ কথাই বলেন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে।

পরিধি অতিক্রম করিয়া না যাইতে পারে তাহা হইলে একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৃত্তটি অতি ক্ষুদ্র, কারণ ইন্দ্রিয়-শক্তির সীমা অতিশয় ক্ষুদ্র। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা বুঝিয়া দেখা প্রয়োজন। আমরা কর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করি। যদি বায়ুর কম্পনটি কোন একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অন্তর্গত থাকে তাহা হইলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে; আর যদি ঐ কম্পন নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী বা কম হয় তাহা হইলে কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যাইবে না। এমন কি যদি ভীষণ একটি শব্দ হয় তাহা হইলেও মাত্র দুইটির মধ্যে উক্ত শব্দের কম্পনের সংখ্যা না থাকিলে আমাদের কর্ণ ঐ শব্দ শ্রবণ করিবে না। চক্ষু সম্বন্ধেও ঐ কথা। কোনও বস্তু দুইটি সীমার মধ্যে অবস্থান করিলেই উহাকে দর্শন করিতে পারা যায়। সুতরাং এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলির অধীন হইয়া কিভাবে সীমিত হয়। সুতরাং ইহা বলা যায়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা গৌণ জ্ঞান। ইহা আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এজন্য শাস্ত্রে বলা হইয়াছে: "আত্মা জ্ঞাত বস্তু হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন।" আবার যখন আমরা বলি যে, 'এই বস্তুটি জানি না' তখন ঐ কথার দ্বারা আমরা এই বুঝিতে পারি যে আমাদের ঐ বস্তু সম্বন্ধে অজ্ঞতার জ্ঞানই আছে, অর্থাৎ আমরা ঐ বস্তুকে বুঝিতে পারি না, অথবা বুদ্ধির দ্বারা উহাকে জানিতে পারি না—জ্ঞানটিই আমাদের আছে। বুদ্ধির দ্বারা কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবকেই অজ্ঞতা বলে এবং অজ্ঞান বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহাকে আমরা গৌণ জ্ঞান বলিয়াছি। ইহা ছাড়া আর এক প্রকার জ্ঞান আছে যে জ্ঞান বুদ্ধি অথবা ইন্দ্রিয়ানুভূতি দিয়া জানা যায় না এবং এই জ্ঞানই যথার্থ

আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়। যে অনুভূতির দ্বারা আমাদের এরূপ জ্ঞান হয় যে, 'এই বস্তুটি আমি জানি' সেই জ্ঞানটি যে আত্মা হইতেই আসিয়া থাকে ইহা আমাদের অজ্ঞাত। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, আত্মা জ্ঞাতও নহেন অজ্ঞাতও নহেন। কিন্তু আসলে এই আত্মা অজ্ঞান ও সকল আপেক্ষিক জ্ঞানের অতীত। "আমাদের পূর্বতন আচার্যদেবেব নিকট ইহাই শুনিয়াছি।"[৯] যদিও এই কেনোপনিষৎ সামবেদেব অন্তর্গত ও অত্যন্ত প্রাচীন, তবুও যে সকল পূর্ববর্তী সত্যদর্শী ঋষির নিকট হইতে পুরুষানুক্রমে ঐ সত্যেব শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে সেই পূর্বতন দিব্যদ্রষ্টা ঋষিকে উল্লেখ করিয়াই আচার্যদেব পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন। তাহাব পব আচার্য আবাব বলিলেন "বাক্যের দ্বারা যাঁহাকে প্রকাশ কবা যায় না, ববং যাঁহাব সাহায্যেই সমস্ত বাক্য উচ্চাবিত হয় তিনিই পবমাত্মা ব্রহ্ম, সাধারণ লোকে যাঁহাব উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[১০] প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরে আমরা যে সমস্ত গুণ আবোপ কবি সেই সকল তাঁহার যথার্থ গুণ নয়। যেমন আমবা বলি ঈশ্বব সদ্‌গুণসম্পন্ন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি তো কেবল সদ্‌গুণসম্পন্ন নহেন—তিনি ভাল ও মন্দ, শুভ ও অশুভ, দোষ ও গুণ সর্ববিধ প্রবৃত্তি ও দ্বন্দ্বের অতীত। আমবা গুণ ও দোষ উভয়কেই পৃথক বলিয়া মনে মনে বিচাব কবি, সদ্‌গুণকে দোষ হইতে

৯। 'ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্‌ব্যাচচক্ষিরে॥"

—কেনোপনিষৎ ১।৩

১০। যদ্বাচানাভ্যুদিতং হেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

—কেনোপনিষৎ ১।৪

পৃথক করি এবং তাহার পর ঐ সদ্‌গুণের আকারটিকে মনের মধ্যেই বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া উহা অন্তরের উপর আরোপ করি এবং বলি যে, তিনি সকল সদ্‌গুণের আধার। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যাঁহাকে আমরা উৎকৃষ্ট বলিতেছি তাঁহাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোন-কিছু আছে, আবার সেই উৎকৃষ্টতর অপেক্ষা এমন উচ্চতর অবস্থা হইতে পারে যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট। এইরূপে দেখা যায়, আমরা এত ভ্রান্ত যে, ঈশ্বরকে 'উত্তম' বা 'উৎকৃষ্ট' বলিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। ভাল ও মন্দ এই কথাগুলি আপেক্ষিক এবং সীমাবদ্ধ। ঈশ্বর সকল আপেক্ষিক রাজ্যেব অতীত; সুতরাং তিনি আমাদের দেওয়া "উৎকৃষ্ট" আখ্যারও অতীত। এইপ্রকারে ইহা প্রমাণ করে যে, যে সকল গুণ বা বিশেষণ আমরা ঈশ্বরে আরোপ করি, শুধু তাহাই বা কেন—যে কোন বাক্য আমরা উচ্চারণ করি, তাহাদের প্রতিটির ভাব ও অর্থ সীমাবদ্ধ। যদি আমরা আরও গভীরভাবে চিন্তা করি তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, প্রজ্ঞাযুক্ত চিন্তার কর্তা ও বক্তা পশ্চাতে না থাকিলে কোন প্রকার চিন্তাও করা যায় না, কোন বাক্যও উচ্চারণ করা যায় না। এই প্রজ্ঞা সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশ হইতে প্রকাশিত হয়। সুতরাং আত্মাই একমাত্র সনাতন সত্য-বস্তু এবং ইহাকে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এই আত্মাই বাক্যের উৎপাদক অথচ বাক্যের দ্বারা এই আত্মাকে প্রকাশ করা যায় না।

ভক্তিমার্গেব সাধকগণ যে সগুণ-ঈশ্বরকে উপাসনা করেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই কি আত্মা? অনেকে বলেন, এক মহান্ পুরুষ আমাদের বিশ্বের ঊর্ধে স্বর্গলোকে অবস্থান করেন এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও আদেশক্রমে আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়াদি পরিচালিত হইতেছে। সেই বিরাট পুরুষই কি আত্মা? অথবা

যাঁহাকে আমরা বিশ্বপিতা গড বা আল্লা ইত্যাদি নামে ভক্তি-নিবেদনের দ্বারা আরাধনা করি তিনিই কি আত্মা? যাঁহাকে আমরা 'স্বর্গস্থিত পিতা' বলিয়া থাকি তিনিই কি আত্মা? সুতরাং আত্মা কোন্ বস্তু? শিষ্যের মনে উত্থিত ঐ সকল প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া তাঁহার আচার্য বলিলেন: "লোকে যাঁহার আরাধনা করে তিনি ব্রহ্ম বা আত্মা নহেন।" নাম-রূপধারী সাকার দেবদেবীর, অথবা নিরাকার সগুণ ঈশ্বরের যিনি আরাধনা করেন তিনি সেই নির্বিশেষ পরম সত্যের বা পরব্রহ্মের উপাসনা করেন না, কারণ তিনি সগুণ ও সাকার ঈশ্বরকেই পূজা করেন। নাম ও রূপ এই দুইটি অজ্ঞান রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং এই দুইটির বিশেষত্ব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে আমরা নাম-রূপধারী বলিয়া কল্পনা করি। এইরূপ কল্পনা মানব-মনের সৃষ্টি। সেইজন্য উহা কাল্পনিক দোষযুক্ত, ও আমরা আমাদের কল্পনার সাহায্যেই ঈশ্বরের সাকার রূপ সৃষ্টি করি এবং তাঁহাতে আমাদের আদর্শ ভাবানুযায়ী বিভিন্ন গুণ আরোপ করিয়া প্রার্থনাদির দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি। প্রার্থনাগুলি মনোগত ভাববিশিষ্ট বাক্যসমষ্টি মাত্র। আমরা সেই সগুণ-ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ঐ বাক্যগুলি বা প্রার্থনাসমূহ বিশেষ কোনও ফললাভের জন্য উচ্চারণ করি। কিন্তু যাঁহার নিকট আমরা এই সকল প্রার্থনা করি তিনি আমাদের বাক্‌শক্তির নিয়ামক নহেন। যাঁহার সাহায্যে আমাদের বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তিনি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা। সেই 'আত্মা' এই উপাসিত সগুণ-ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বস্তুতঃ নাম-রূপধারী সগুণ-ঈশ্বর নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন। এই উক্তি আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক বোধ হইতে পারে। তথাপি আমাদের উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে

ঈশ্বরের নাম ও রূপ আছে এবং যাঁহাকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যায়, এবং মনের দ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করা যায় তিনি কখনই বাক্য ও মনের অগোচর নির্বিশেষ নহেন। শ্রুতিতে এইরূপ বলা হইয়াছে: "যখন ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইয়াছি বলা যায় তখন তিনি আর ব্রহ্ম নহেন; যাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া থাকি তিনি আমাদের কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহেন।"[১১] যাঁহাকে পূজা করা যায় সেই সগুণ দেবতা হইতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্পূর্ণ পৃথক্।

যাঁহাকে আবার মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় তিনিও ব্রহ্ম নহেন। সেজন্য আচার্য বলিলেন: "যিনি মনের অগোচর এবং মনের দ্রষ্টা তাঁহাকেই তোমার আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কিন্তু লোকে যাঁহার আরাধনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[১২] "চক্ষুর দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করা যায় না, কিন্তু যাঁহার সাহায্যে চক্ষু দর্শন করে তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু লোকে যাঁহার উপাসনা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[১৩] "কর্ণ দ্বারা যাহাকে শ্রবণ করা যায় না, বরং কর্ণই যাঁহার দ্বারা শব্দাদি শ্রবণ করে তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু যাঁহাকে লোকে পূজা করে তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[১৪] "লোকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করিতে

১১। চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

১২। যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদিং যদিদমুপাসতে॥ —কেনোপনিষৎ ১।৫

১৩। যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥—কেনোপনিষৎ ১।৬

১৪। যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
—কেনোপনিষৎ ১।৭

সমর্থ হয় না, বরং যাঁহার সাহায্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রাণ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে; কিন্তু জনসাধারণের দ্বারা যিনি উপাসিত হন তিনি ব্রহ্ম নহেন।"[১৫] এই শ্লোকগুলি হইতে বুঝা যায় যে, মন এবং ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক আত্মা ও সগুণ ঈশ্বর এক নহেন; কিন্তু আত্মা ও নির্বিশেষ সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এক।

আচার্যের নিকট আত্মা-সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্য সেই বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়াতীত আত্মা অথবা ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার জন্য নির্জন স্থানে চলিয়া গেলেন। তিনি কিছুকাল ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন ও আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সাধারণ জ্ঞানরাজ্যে আবার মনকে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার আচার্যের নিকট গমন করিয়া বলিলেনঃ "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি ও সেই পরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া তাঁহার গুরুদেব বলিলেনঃ "তুমি যদি মনে কর যে, তুমি আত্মাকে জানিয়াছ তাহা হইলে স্থির জানিও যে, তুমি আত্মার স্বরূপ অতি অল্পই জ্ঞাত হইয়াছ।"[১৬] যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে যে, তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়াছ তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তোমাতে ও নিখিল বিশ্বে ওতপ্রোতঃ সেই সত্যস্বরূপের অতি সামান্যই তুমি অবগত হইয়াছ। সত্য এক, উহা একের অধিক নহে।

১৫। যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
—কেনোপনিষৎ ১।৮

১৬। যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি,
নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্॥—কেনোপনিষৎ ২।৯।১

এই সত্যকে জানিয়াছ এইরূপ যদি তোমার মনে হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তুমি বুদ্ধির দ্বারা তোমার গৌণ জ্ঞান লইয়াই এইরূপ বলিয়াছ। ইহা নিশ্চয় জানিও যে গৌণ জ্ঞানের দ্বারা সেই নিগু´ণ ব্রহ্মের স্বরূপ কখনই প্রকাশ হইতে পারে না। তুমি ব্রহ্মকে বা আত্মাকে জানিয়াছ এই বিশ্বাসকে যদি অন্তরে স্থান দাও তাহা হইলে মনের পরিচালক সেই আত্মাকে তুমি অল্পই জানিয়াছ। আর তুমি যদি এরূপ মনে কর যে, তিনি তোমার দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন তাহা হইলে তাঁহার নিগু´ণত্ব সম্বন্ধে তুমি কিছুই বুঝিতে পার নাই। আবার তিনি তোমার দেহের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ ভাবেই যদি তুমি তাঁহাকে জানিয়া থাক তাহা হইলে তোমার সেই পরমসত্যের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আবার তুমি যদি সেই আত্মা বা ব্রহ্মকে ঈশ্বর বা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা-রূপেই মাত্র জানিয়া থাক তাহা হইলেও তুমি তাঁহার সম্বন্ধে অতি অল্পই বুঝিতে পারিয়াছ। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি আমাদের দেহের মধ্যেই আত্মা বাস করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহার বিষয় অতিঅল্পই জানা হইবে? প্রকৃতপক্ষে ঐ অবস্থায় আত্মাকে অতি অল্পই জানা হইল, কারণ যিনি মনের পরিচালক তিনি তো আর একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকিতে পারেন না। আত্মার পরিব্যাপ্তি কোন দেশের মধ্যে সামাবদ্ধ নহে; ইনি দেশসীমার অতীত, সুতরাং আত্মা কেবল একটি স্থানেই আছেন আর অপর স্থানে নাই এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা সেই অসীম সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি কখনই হইতে পারে না। আবার যদি আমরা মনে করি যে, তিনি আমাদের অন্তরে নাই, কিন্তু আমাদের বাহিরেও আছেন তাহা হইলে তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব এবং দেশ ও

কালের অতীত ভাবটির উপলব্ধি হয় না। যাহা দেশ ও কালের এবং উহাদের সম্বন্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাহার অসীমতাকে আমরা অতি সামান্য মাত্রই জানিয়াছি।

এইপ্রকার উপদেশ শ্রবণ করিয়া সেই আত্মজিজ্ঞাসু শিষ্য পুনরায় উপযুক্ত স্থানে যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তিনি চিন্তার রাজ্য অতিক্রম কবিয়া সমাধির অবস্থায় উপনীত হইলেন। সমাধির অবস্থায় কিছুকাল থাকিবার পরে তিনি আবার মন ও ইন্দ্রিয়েব রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেনঃ "আমি আত্মা বা ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে বিদিত হইয়াছি বলিয়া মনে করি না; আবাব তাঁহাকে যে একেবারেই জানি নাই এই কথাও বলিতে পাবি না। আত্মা জ্ঞাত হইবাব নহে বলিয়াই মনে করিতে হইবে যে, আত্মা একেবাবেই অজ্ঞাত—এমন নহে; যিনি এইভাবে সত্যকে জানিয়াছেন তিনি সেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন।"[১৭] তাঁহার ঐ উক্তির তাৎপর্য এই যে, আত্মজ্ঞান অজ্ঞান ও আপেক্ষিক জ্ঞানের অন্তর্গত নহে, ইহা উহাদের অতীত জ্ঞান। আমরা বিচার-বুদ্ধির দ্বাবা যাহা-কিছু জানিয়া থাকি তাহা সেই আত্মা হইতে উদ্ভাসিত জ্ঞানালোকের সাহায্য ভিন্ন জানিতে পারি না। আত্মার জ্ঞাতা আর কেহ নাই যিনি মন ও চিন্তাসমূহকে আলোক দান করিতে সমর্থ হইবেন। বস্তুতঃ আত্মাই একমাত্র নিত্য ও জ্ঞাতা। এই বিশ্বের এমন কিছু নাই যাহা আত্মার জ্ঞাতা: বরং এই আত্মাই আমাদের সমস্ত জ্ঞানের আকর; অর্থাৎ যত প্রকার জ্ঞান আছে তাহা

১৭। নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥
—কেনোপনিষৎ ২।১০।২

আত্মা হইতেই উদ্ভূত।[১৮] এই আত্মা সর্বদাই জ্ঞাতা, অর্থাৎ বিষয়ীভাবে অবস্থিত ; ইনি কখনও জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয় হন না। আত্মজিজ্ঞাসু সাধক আরও বলিলেনঃ "যিনি মনে করেন যে, আত্মা জ্ঞানের বিষয় নহেন, তিনিই যথার্থ তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু যিনি মনে করেন 'আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি' তিনি ব্রহ্মকে যথার্থ বুঝিতে পারেন নাই। যাঁহারা মনে করেন ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই। কিন্তু যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রহ্ম কখনই জানা যায় না, তাঁহারাই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন।"[১৯]

উপরের উক্তি যেন একটি প্রহেলিকার ন্যায় মনে হয়। বাস্তবিক উহার অর্থ কি হইতে পারে ? যদি আমরা আমাদের অনুভূতিগুলি বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে আমরা কি দেখিতে পাই ? মনে করা যা'ক যে, আমরা কোনও একটি রূপ দর্শন করিতেছি। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই জানি যে, আকাশের অর্থাৎ "ইথার" নামক পদার্থের বিশেষ একপ্রকার কম্পনের দ্বারা আলোকরশ্মি সৃষ্টি হয় ও রূপের অনুভূতিটি ঐ আলোকের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আমাদের চক্ষুর মধ্যে ঝিল্লীতে আলোকরশ্মি পতিত হইলে উহার মধ্যে একপ্রকার আণবিক কম্পন ও পরিবর্তন হয় এবং উহা আক্ষিক স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিষ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র কোষগুলিতে প্রেরিত হইলে উহা হইতেও একরূপ আণবিক কম্পন সৃষ্টি হয়। তাহার পর ঐ কম্পনগুলিকে অনুভূতিতে পরিণত করিতে অর্থাৎ উহা যে

১৮। তত্র নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্—পাতঞ্জলদর্শন

১৯। যস্যামতং তস্য মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥
—কেনোপনিষৎ ২।১১।৩

একপ্রকাব অনুভূতি তাহাব পবিচয দিতে একজন চৈতন্যযুক্ত 'অহং' বা 'আমি' থাকা প্রযোজন এবং এই পরিচয দেওয়াব ব্যাপাব শেষ হইলে বুঝিতে পাবি যে, আমবা একটি রূপ দেখিতেছি। যদি উক্ত 'অহং' না থাকে তাহা হইলে কম্পনগুলি মস্তিষ্কেব অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে যাইযা অন্যান্য প্রকাব পবিবর্তন সংসাধিত কবিতে পাবে, কিন্তু তখন আব আমাদেব ঐ 'রূপ'সম্বন্ধে কোন প্রকাব অনুভূতি হয না। যেমন একটি দৃশ্যেব উপব আমাদেব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলেও যদি হঠাৎ আমাদেব মন অন্য একটি বস্তুব বা বিষযেব উপব আকৃষ্ট হয তাহা হইলে উক্ত দৃশ্যটি চক্ষুব সম্মুখে থাকিলেও আমবা আব উহা দেখিতে পাইব না। এখানে আলোকেব কম্পন মস্তিষ্কেব অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে চলিযা গিযাছে এবং যথাযথভাবে আণবিক পবিবর্তন হইযাছে ও অনুভূতিব নিমিত্ত শাবীবিক অন্যান্য পবিণতি সকলগুলি ঘটিযাছে, তথাপি 'অহং' বা জ্ঞাতা না থাকায দৃশ্যেব অনুভূতি হইল না। কম্পনগুলিব অর্থ বুঝাইবাব জন্য সেই চৈতন্যযুক্ত 'আমি' বা 'অহং' তখন অন্য কোনও বিষযেব উপব মনঃসংযোগ কবিযা আছে। কিন্তু যখনই ঐ 'অহং' উপবি-উক্ত পবিবর্তন বুঝায তখনই আমাদেব অনুভূতি হয। এই ব্যাপাবটি আবও গভীবভাবে অনুধাবন কবা যাক্। আমাদেব নিশ্চযাত্মিকা বুদ্ধিব পিছনে 'অহং' বা 'আমি' জ্ঞান থাকে। এই 'অহং' যদি প্রজ্ঞাহীন হয়, অর্থাৎ 'আমি', 'আমাব' এই জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে আলোকেব কম্পনবাশি ইন্দ্রিযদ্বাব দিযা প্রবেশ কবিয়া মনেব মধ্যে কোনরূপ অনুভূতি উৎপাদন না কবিয়াই বাহির হইযা যাইবে। আবার যদি মন অনুভূতি ও বুদ্ধিব মূল হইতে পৃথক্ অবস্থায় থাকে তাহা হইলে চৈতন্য সংযুক্ত 'আমি'-ব সহিত কোনরূপ সংস্পর্শে

না আসিয়া অনুভূতিগুলি মনের অবচেতনস্তরে থাকিয়া যাইবে। যিনি এই অনুভূতিরূপ জ্ঞানের মূল অধিষ্ঠানরূপে অবস্থিত তিনিই আমাদের প্রকৃত আত্মা।

যখন বসিয়া থাকি তখন জানি যে, আমরা বসিয়া আছি। যখন ভ্রমণ করি তখন বুঝিতে পারি যে ভ্রমণ করিতেছি ; যখন আমরা কোনও কার্য করি তখন আমাদের জ্ঞান থাকে যে আমরা ঐ কার্য করিতেছি। যিনি এইরূপ সকল কার্যের বা চিন্তার জ্ঞাতা তিনিই আমাদের দেহ ও মনের যন্ত্রী বা সর্ববিষয়ের পরিচালক। উক্তপ্রকার জ্ঞান কি আমাদের আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার জ্ঞান বিশেষ? না, তাহা নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে আত্মার সহিত অভিন্ন। আমাদের আত্মা যেন একটি জ্ঞানসমুদ্র-বিশেষ। কেহ কেহ বলেন যে, আত্মা হইতে জ্ঞান সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ যাহা হইতে জ্ঞানরাশি প্রবাহিত হয় তাহাই আত্মা ; উহার দ্বারা এইরূপ বোধ হয় যে, আত্মা জ্ঞান হইতে পৃথক্ এবং ইহার সহিত এই প্রশ্নও আসে যে, তাহা হইলে আত্মার স্বভাব বা ধর্ম কি? অদ্বৈত বেদান্তের মতে 'আত্মা' একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ বা একমাত্র অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ (absolute intelligence) এবং উহা অপরিবর্তন-শীল। মন ও বুদ্ধির বৃত্তিগুলির অবিরাম পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান অপরিবর্তনশীল। আমাদের হৃদয়ে যখন একটি ভাবের প্রকাশ হয় তখন আমরা তাহা বুঝিতে পারি ও অনুভব করি যে, ঐ ভাবটির প্রকাশ হইয়াছে আবার যখন ঐ ভাব অন্তর্হিত হয় ও সেইস্থানে অপর একটি ভাবের প্রকাশ হয় তখনও আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ব স্থানে একটি নূতন ভাব অধিকার করিয়াছে। যে জ্ঞানবিশেষের দ্বারা আমরা প্রতিটি নূতন ভাবকে ধরিতে পারি তাহা অন্য কোন প্রকার জ্ঞানের

দ্বারা সম্পন্ন হয় না, কারণ এই বিশ্বচরাচরে জ্ঞান কেবল একটিই আছে; সুতরাং ঐ জ্ঞানের জ্ঞাতাকেও অন্য কোন জ্ঞান দিয়া জানিতে পারা যায় না। যাহার দ্বারা আমরা একটি ভাবের বা অনুভূতির সত্তা জানিতে পারি তাঁহাকে বুদ্ধি, বিচার বা অন্য কোনও মনোবৃত্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারা-রূপ ব্যাপারটি ইহারই উপর নির্ভর করে। যখনই আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বিষয় বুঝিতে পারি তখনই বুঝিতে হইবে যে, উহা মন ও বুদ্ধির পরিচালক একমাত্র নির্বিশেষ জ্ঞানস্বরূপ আত্মারই আংশিক প্রকাশমাত্র।

সর্বজ্ঞতাই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম। এই ধর্ম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধের উপর আদৌ নির্ভর করে না। বস্তুতঃ সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্ব লোপ পাইলেও এই নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোনও প্রকার পরিবর্তন হয় না। সর্বজ্ঞ আত্মাকে স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের সহিত তুলনা করিলে ব্যাপারটি সহজবোধ্য হয়। সূর্য যেমন নিজের আলোকে আলোকিত হন এবং অন্য পদার্থকেও আলোকিত করেন সেইরূপ আত্মাও নিজের জ্যোতিতে নিজে উদ্ভাসিত ও সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত বাহ্যজগৎকেও উদ্ভাসিত করেন। সূর্য সমস্ত পদার্থকে আলোক দান করেন এবং সেই সঙ্গে স্বয়ংও আলোকিত হন, সূর্যকে দেখিবার জন্য কোনও প্রদীপ প্রজ্বলিত করিবার প্রয়োজন হয় না, আর এজন্য সূর্যকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়। যাহা স্বয়ংপ্রকাশ তাহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অপর বা প্রদীপের আলোকের সাহায্যের কি আবশ্যক? এই কারণেই আত্মাকে জ্ঞানসূর্য বলা হইয়া থাকে। যে জ্ঞান দ্বারা আমরা সর্বপ্রকার অনুভূতি এবং ভাব বুঝিতে পারি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের

বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাইয়া থাকি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা মনোবৃত্তির ও চন্দ্র সূর্যাদির সমস্ত কার্যকে জানিতে পারি, যে জ্ঞান দ্বারা আমরা আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াসমূহ বুঝিতে পারি তাহা সেই প্রজ্ঞা বা সংবিদের আকর স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই স্বয়ংপ্রকাশ আত্মাই সর্ববিষয়ের জ্ঞাতা এবং ইনিই মন ও ইন্দ্রিয়াদির একমাত্র পরিচালক ও নিয়ামক। এই আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিলে মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ কোন কার্যই করিতে পারে না। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সূক্ষ্মতর জড়তন্মাত্রের কম্পনবিশেষকে 'মন' বলে। বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আত্মা এবং মন এক নহে। মনের উপাদানরূপ তন্মাত্রের কম্পন সন্দেহের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ নাই; এই মন সংবিদের বা চৈতন্যের উৎস নহে, অর্থাৎ জ্ঞান মনঃপ্রসূত নহে। মন যাবতীয় ক্রিয়ারহিত হইয়া গেলেও আমাদের 'অহং'-জ্ঞান থাকিয়া যায়। সমাধির অবস্থায় কাহারও ভয়, ক্রোধ বা মনের অন্যান্য বৃত্তিসমূহ যথা প্রবৃত্তি, বাসনা, উচ্ছ্বাস, ইচ্ছা, সঙ্কল্প, বিকল্প, নিশ্চয়, অনুভব ইত্যাদি না থাকিলেও প্রকাশরূপ প্রজ্ঞা চলিয়া যায় না, বা সেই সমাধিবান ব্যক্তি সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হন না। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মা মনোরাজ্যের কার্যাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র।

সমাধির অবস্থায় উপনীত হইয়া সর্বপ্রকার অনুভূতি, মন এবং ইন্দ্রিয়ের কার্যকে নিরোধ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ এই সময়ে দেহ ও মনের সম্পর্ক না রাখিয়া সমাধিবান পুরুষ মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্য অতিক্রম করিয়া উহা অপেক্ষা আরও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারেন। যাঁহাদের কখনও সমাধি হয়

নাই তাঁহাদের পক্ষে এই সত্য উপলব্ধি করা অসম্ভব। বুদ্ধিপ্রসূত আপেক্ষিক জ্ঞানদ্বারা আত্মা প্রকাশিত হন না। এই আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিন্তার রাজ্য ছাড়াইয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইবার উপায় শিক্ষা করিতে হইবে। বুদ্ধির দ্বারা আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি তাহা আপেক্ষিক এবং অসম্পূর্ণ ; স্নুতরাং আমাদের বিচাব-বুদ্ধি পরিদৃশ্যমান জগতের সীমা অতিক্রম করিয়া সেই অসীমের রাজ্যে পৌছাইয়া দিতে সক্ষম নহে। সেইজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছেঃ "যিনি মনে করেন যে তিনি আত্মাকে জানিয়াছেন, তিনি আত্মাকে একেবারেই জানেন নাই।"

ঈশ্বব-সম্বন্ধে আমরা যে কল্পনা কবিয়া থাকি সেই সমস্ত কল্পনা হইতে আত্মজ্ঞান বহু ঊর্ধে অবস্থিত ; কাবণ ঈশ্বরসম্বন্ধে সমস্ত ধারণাই আমাদের মনের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু যদি মন প্রজ্ঞা হইতে পৃথক্ বা বিচ্ছিন্ন থাকে তাহা হইলে ঐ ধারণা বা কল্পনা লুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহাব কোন অস্তিত্বই থাকে না। আমাদের ভিতব প্রজ্ঞা বা জ্ঞান আছে বলিয়াই ঈশ্ববের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার আলোক ঈশ্বরের অস্তিত্বেব পবিচয় করাইয়া দেয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা কবিতে পারি যে, সগুণ ঈশ্বর ও আত্মা—ইহাদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌টি মহত্তর ? আত্মাই মহত্তর ; কারণ ইহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের অধিষ্ঠান সত্যস্বরূপ এই আত্মা সগুণ-ঈশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ সগুণ-ঈশ্বরকে বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করা যাইতে পারে ও মনের দ্বারা চিন্তা করা যাইতে পারে, সেইজন্য তিনি বাক্য ও মনের পরিচালক

সেই আত্মারও অধীন।[২০] আমরা ইহাও জানি যে, যিনি যাহার অধীন তিনি আত্মা অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিকৃষ্ট। আবার ইহাও সত্য যে, যখন আমরা আমাদের আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করি তখন আমরা একটি পুস্তক বা একটি বৃক্ষের ন্যায় আত্মাকে জ্ঞেয়ভাবে জানিতে চেষ্টা করি না; আত্মা কখনই জ্ঞেয় হইতে পারে না। আত্মা সর্বদাই জ্ঞাতা। আত্মার কোনও প্রকার আকার দেখিতে চেষ্টা করা বৃথা; কারণ আত্মার কোন আকার নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদির মধ্যে আমাদের আত্মার অনুসন্ধান আরম্ভ করাও বৃথা, কারণ উক্ত পদার্থগুলি আপেক্ষিক রাজ্যের বস্তু বা বিষয়। কিন্তু আত্মা অতীন্দ্রিয় ও নির্বিশেষ এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এইরূপে আপেক্ষিক ও নির্বিশেষ রাজ্যের মধ্যে কি প্রভেদ তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যতক্ষণ আমরা আপেক্ষিক রাজ্যে অবস্থান করিব ততক্ষণ আমরা নির্বিশেষকে পাইব না, কারণ এক নির্বিশেষ জ্ঞান দ্বারাই পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ বস্তুসকলের অস্তিত্ব আমরা জানিয়া থাকি এবং সেইজন্যই সম্বন্ধভাবযুক্ত সসীম রাজ্যের বাহিরে এই নির্বিশেষতত্ত্ব থাকে এবং সর্বদা বাহ্য বিষয়সমূহ সেই অসীমের অন্তর্নিহিত এবং তাহারই সত্তায় সত্তাবান্; কিন্তু সেই নির্বিশেষ আত্মা স্বাধীন এবং স্বয়ম্ভূ। যদি আমরা বিচার-বুদ্ধিহীন হইতাম এবং যদি ঐ অবস্থায় আমাদের মধ্যে আত্মজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে আমাদের সহিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান এবং মনোবৃত্তির কোনও সম্বন্ধ থাকিত না, অর্থাৎ অনুভূতিসাপেক্ষ কোনপ্রকার জ্ঞানই

২০। তাহা ছাড়া সগুণ-ব্রহ্ম বলার অর্থই ব্রহ্মের সহচারীরূপে মায়া থাকে বা যে মায়া সমষ্টি-অজ্ঞান।

আমাদের হইত না। মুক্তার মালা যেমন একই সূত্রে গ্রথিত থাকে সেইরূপ এক নির্বিশেষ আত্মরূপী সূত্রে আমাদের বিভিন্ন চিন্তারাশি, বিভিন্ন ভাব এবং চিত্তবৃত্তিরূপ মুক্তাগুলি গ্রথিত হইয়া একটি সুন্দর মালার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। নির্বিশেষ আত্মা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতারূপ মুক্তাগুলিকে যথাযথস্থানে গ্রথিত করিয়া সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন অখণ্ড মালার আকারে পরিণত করিতেছে, অর্থাৎ এই নির্বিশেষ জ্ঞানের মধ্যেই আপেক্ষিক জ্ঞানরাশি মুক্তাকারে যেন শোভিত হইতেছে। কিন্তু কেহ যেন এরূপ ভ্রম না করেন যে, এই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান এবং সাধারণ আপেক্ষিক জ্ঞান একই শ্রেণীভুক্ত; কারণ প্রথমটি অসীম এবং দ্বিতীয়টি সসীম ও অজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞানমাত্র। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ আত্মা অজ্ঞানতাকে জানাইয়া দেয় বলিয়া সকল প্রকার আপেক্ষিক জ্ঞান অপেক্ষা উহা উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ। এই আত্মজ্ঞানের আলোকেই আমরা 'ইহা জানি, ইহা জানি না' এইপ্রকার উপলব্ধি করিতে পারি।

বেদান্ত বা উপনিষৎ বলেঃ "যিনি দর্শন করেন, যিনি শ্রবণ করেন, যিনি চিন্তা করেন, যিনি মনোগত ভাব-রাশিকে উপলব্ধি করেন তাঁহার সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞাতা যিনি তিনিই আত্মা, কিন্তু দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত এই সকলগুলিকে আমরা আত্মা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি : প্রকৃত-পক্ষে ইহারা আত্মা নহে। ইহাদিগকে যিনি জানেন, তিনিই আত্মা।"

উক্তপ্রকার দেহাত্মবোধে ক্রমে আবদ্ধ হইয়া আমরা বলি যে, 'আমি দেহ ও ইন্দ্রিয়যুক্ত', 'আমিই দ্রষ্টা', 'আমিই শ্রোতা', 'আমিই মন-বুদ্ধিযুক্ত', 'আমিই চিন্তা করিতেছি'। এই 'অহং'

বা 'আমি'-রূপ আত্মার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বলিয়াই আমরা ঐরূপ অহং-ভাবাপন্ন হই। বস্তুতঃ এই 'অহং'-অভিমান বা জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না। আত্মজ্ঞান এবং আমাদের অস্তিত্ব বা সত্তা, অভিন্ন ও এক। 'এইস্থানে আমরা আছি' এই প্রকার যে জ্ঞান তাহা আমাদের স্বতঃই বিদ্যমান। যদি মুহূর্তের জন্য আমাদের এই জ্ঞান চলিয়া যায়, অথবা যদি মুহূর্তের জন্য আমাদের পারিপার্শ্বিক জ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ সময়ের জন্য আমাদের চারিদিকে অবস্থিত বিষয়গুলির সহিত সমস্ত সম্বন্ধই হারাইব এবং ঐ কালের জন্য আমাদের অস্তিত্বও থাকিবে না। এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা আমাদের অস্তিত্ব বা সত্তা হইতে আত্মজ্ঞানকে পৃথক করিতে চেষ্টা করিলেও উহাতে কখনই কৃতকার্য হইব না। মায়ামুক্ত আত্মজ্ঞান ও সত্তা অবিচ্ছেদ্য। যখন আমরা আত্মজ্ঞান উপলব্ধি করিব তখন আমরা আমাদের অস্তিত্বও বুঝিতে পারিব এবং দেখিতে পাইব যে, মনের পরিচালক আত্মাই অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ এবং অসীম সত্তাস্বরূপ। 'সূর্য আছেন' এই কথা আমরা বলি কেন? কারণ সূর্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা ইহা বলিয়া থাকি। যখন তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান থাকে না, যেমন সমাধিতে আপেক্ষিক সম্বন্ধের দিক দিয়া কোন জ্ঞানই আমাদের থাকে না। সুতরাং সত্য যে, আমাদের আপেক্ষিক জ্ঞান ও আপেক্ষিক সত্তার মাপকাঠি 'প্রজ্ঞা' বা 'অহং'-জ্ঞান, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই বোধ না থাকিলে অপর কোন বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে কিছুই আমি জানিতে পারিব না, বা 'অপর কিছু আছে' এইপ্রকার জ্ঞানও আমার হইবে না। যে মুহূর্তে আমাদের দেহের জ্ঞান এবং

পারিপার্শ্বিক বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, সেই মুহূর্তেই আমাদের নিকট উহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সর্বপ্রকার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ব্যাপার আমাদের সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রার সময় ঘটিয়া থাকে। সেজন্য সেই সময়ে আমরা 'ইহা আমার' 'উহা আমার' এইপ্রকার ধারণা করিতে পারি না; কিন্তু আবার দেহে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিতে থাকে তখনই সঙ্গে সঙ্গে দেহটিকে এবং তাহার সংস্পর্শে সমস্ত বস্তুকেই 'আমার' বলিয়া অনুমিত হয়; অতএব দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধজ্ঞান এবং নির্বিশেষ সত্তা এই দুইটি এক ও অভিন্ন।

বেদান্তদর্শনে মনের পরিচালক আত্মার স্বভাব দুই প্রকার বলা হইয়াছে ঃ একটির নাম 'সৎ' বা সত্তা অর্থাৎ যাহা নিত্য বর্তমান এবং অপরটির নাম 'চিৎ' অর্থাৎ যাহা নিত্যপ্রকাশ বা জ্ঞান। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, এই 'সৎ' এবং 'চিৎ' অবিচ্ছেদ্য; একটি থাকিলেই অপরটিও থাকিবে। বেদান্ত-দর্শনে আবার আর একটি ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার নাম 'আনন্দ'। যেখানে 'সৎ' ও 'চিৎ' বর্তমান থাকে সেখানে 'আনন্দ' ও বর্তমান থাকিবে। এই নিত্য আনন্দের সহিত পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়সুখের এবং অনিত্য বিষয়জনিত বিষয়া-নন্দের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। যেখানে 'নিত্য আনন্দ' বর্তমান সেখানে চিরশান্তিও বিরাজমান থাকিবে, এবং সেই অবস্থায় মন অন্য কিছুই না চাহিয়া ঐ আনন্দই উপভোগ করিবে ও যাহাতে উহার বিচ্ছেদ না আসে সেইরূপ ভাবকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। কখনও কখনও আমরা সাধারণ আনন্দকে অর্থাৎ বিষয়ানন্দকে আত্মানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ভ্রমে পতিত হই। বিষয়ানন্দ[২১] যখন ভোগ করা যায় তখন

২১। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলে তাহা উপভোগের যে আনন্দ হয় তাহাকে বিষয়ানন্দ বলে।

উহা সেই সময়ের জন্য মধুর মনে হয়, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উহাতে বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন ঐ বিষয় ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা না করিয়া উহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। একবার ভাবিয়া দেখুন, ইন্দ্রিয়ভোগ হইতে সৃষ্ট সুখ কিরূপ ক্ষণস্থায়ী। উহা অতি অল্প সময়ই থাকে এবং উহার প্রতিফলও অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা অবিনাশী 'আনন্দ' তাহাকেই 'ব্রহ্মানন্দ' বলে। ইহা অপরিবর্তনশীল, চিরস্থায়ী এবং তাহার কোনপ্রকার প্রতিক্রিয়া নাই। যখন দেহাত্ম-বোধ চলিয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হয় তখনই ব্রহ্মানন্দ ও নির্মল শান্তি বিরাজ করে। আত্মার রাজ্য স্বভাবতই এইপ্রকার ; ইহা আপেক্ষিক জগতের এবং পার্থিব নিয়মাদির সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। পূর্বে বর্ণিত সেই সত্যান্বেষী সাধক পরিশেষে জগতের সমস্ত বস্তুর মূলকারণ ও মনের পরিচালক আত্মাকেই সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে সমাধির অবস্থায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তাহার পর তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মাকে উপলব্ধি করেন, তিনি অমরত্ব লাভ করেন। দেহের পরিবর্তনের নামই মৃত্যু। এই দেহের মৃত্যু হইতে পারে, ইন্দ্রিয়াদির মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার কখনও মৃত্যু নাই, নাশ নাই। যখন জানিতে পারি যে, দেহের মৃত্যু বা নাশ ঘটিতেছে তখন যদি আমরা তাহার সহিত আমাদিগকে একাত্মবোধ দ্বারা একীভূত না করি এবং তখন যদি আমরা আমাদের নির্বিশেষ আত্মাকে দেহ হইতে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অমরত্ব লাভ করিতে পারিব। একবার যদি আমাদের মধ্যে 'সোঽহং আত্মা' অর্থাৎ 'আমি সেই আত্মা' এই অনুভূতি হয়

তাহা হইলে মৃত্যুও কি উহা আর পরিবর্তন করাইয়া দিতে পারে? যাহা 'অসৎ' অর্থাৎ যাহা নাই তাহা হইতে 'সৎ,-এর উৎপত্তি হইতে পারে না; সেইরূপ 'সৎ' কখনও 'অসৎ'-এ রূপান্তরিত হয় না। যাহা 'নিত্য' তাহা অনিত্য হইতে পারে না[২২] এবং ইহাই অমরত্ব বা অমৃতত্বের প্রমাণ।[২৩] নির্বিশেষ জন্ম-মৃত্যুহীন আত্মাই সেই নিখিল বিশ্বের আদি ও অন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। ঐ নিত্য আত্মা বা ব্রহ্মকে বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন আকারে সাধারণ লোক 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। ঐ ব্রহ্মই অন্তরাত্মারূপে আমাদের অন্তরে বাস করেন এবং আমাদের আত্মা হইতে ঐ 'ব্রহ্ম' অভিন্ন। তাঁহাকেই উপনিষদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কারণ উহা এক ভিন্ন বহু নহে। যিনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম বহু হইত তাহা হইলে একটি অপরটির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া যাইত, সুতবাং তাঁহারা অসীম ব্রহ্ম হইতে পারিত না। এক ব্রহ্মই অবিনশ্বর ও মৃত্যু-রহিত। একমাত্র ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াই আমরাও অমৃত হইতে পারি। যদি স্বভাবতঃই আমাদের আত্মাতে অমরত্ব নিহিত না থাকে তাহা হইলে কোনও অবতার-পুরুষই উহা আমাদিগকে দান করিতে সক্ষম হইবেন না। খৃষ্টান্ধর্ম্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে, একমাত্র ঈশ্বরাবতার যীশুখৃষ্টের কৃপাতেই মরণশীল জীব অমর হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ওই' বিশ্বাস আমাদের আত্মার অমরত্বরূপ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

২২। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

—গীতা ২।১৬

২৩। গীতায় ও উপনিষদে আছে 'অসতাৎ ন সজ্জায়তে' —সৎ বা সত্তা থেকে কখনও অসৎ বা অসত্তা জন্মায় না।

খৃষ্টানদের এইরূপ বিশ্বাসে ও উপদেশে বেদান্তমতাবলম্বীরা প্রতারিত হন না। তাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ বা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, তাহার পর তাঁহারা জানিতে পারেন যে, অমরত্বলাভে তাঁহাদের জন্মগত অধিকার।

আত্মা সর্বপ্রকার শক্তির কারণ এবং এইজন্য শিষ্য বলিলেনঃ "আত্মজ্ঞানের দ্বারা অলৌকিক শক্তি ও অমরত্ব লাভ করা যায়।" অপরিবর্তনশীল অবিনশ্বর আত্মাকে জানিতে পারিলেই আমাদের মধ্যে প্রকৃত আত্মিক শক্তি উদ্বুদ্ধ হইবে। আত্মজ্ঞানের দ্বারা যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায় তাহা ভৌতিক, দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তিসমূহের সমষ্টি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিক শক্তি ভিন্ন আর সকলপ্রকার শক্তিই পরিবর্তনশীল ও মৃত্যুর অধীন। অতিঅল্প লোকেই কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির অর্থ ঠিক্ ঠিক্ বুঝিতে পারেন। 'আত্মা' শব্দদ্বারা 'প্রেতাত্মা'কে বুঝায় না; ইহার দ্বারা 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্ম'কে বুঝিতে হইবে। চৈতন্যস্বরূপ আমাদের আত্মা সেই ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কোন বস্তু নহে। ব্রহ্ম বা আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিলেই দৈহিক ও মানসিক শক্তি অপেক্ষা মহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যায়। এই শক্তি সেই অনন্ত ব্রহ্মের বা আত্মারই শক্তি। দৈহিক শক্তির সাহায্যে হয়তো একজন একটি ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন বা সহস্র সহস্র প্রাণী বধ করিতে পারেন, কিন্তু ঐ শক্তি তাহাকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। যদি কাহারও প্রভূত আধিভৌতিক ক্ষমতা থাকে তাহা হইলেও উহা তাহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। কাহারও হয়তো অদ্ভূত মানসিক শক্তি ও যোগের বিভূতি থাকিতে পারে এবং ঐ শক্তির সাহায্যে তিনি অনেক আশ্চর্যজনক কার্যাদি করিতে পারেন,

কিন্তু তাঁহার দেহ ও মনের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন স্বতঃই হইয়া থাকে, তিনি ঐ শক্তির দ্বারা তাহা স্থগিত রাখিতে পারেন না। অপরপক্ষে আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হইলেই জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যিনি কেবল দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তিনি জন্ম ও মৃত্যুর অধীনেই থাকিবেন, কিন্তু তিনি যদি সেই অবিনাশী ব্রহ্ম বা আত্মাকে বিদিত হইতে পারেন তাহা হইলে তিনি এই বিশ্বের প্রভু বা নিয়ন্তাও হইতে পারেন। যাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে, প্রাকৃতিক বিরাট্ শক্তিসমূহ তাঁহার সেবা করে এবং আদেশপালন করে। "যদি কেহ এই জীবদ্দশায় আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। এই মায়াময় জগতে যিনি আত্মাকে জানিয়েছেন তিনিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন ; তিনিই মোক্ষ, পরাশান্তি এবং প্রকৃত আনন্দ এই জীবনে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে এই জীবদ্দশায় জানিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহার অদৃষ্টে অনেক দুঃখভোগ আছে।"[২৪] যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিতে না পারেন, তিনি এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়সুখের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকেন ও অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না।

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ চেতন ও অচেতন বস্তুতে ব্যাপ্ত সেই সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া দেহত্যাগ করিবার পরে

২৪। "ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি, ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"
—কেন উপনিষৎ ২।৫

অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।[২৫] যিনি সেই একমাত্র অবিনাশী আত্মা বা ব্রহ্মকে বিদিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার সহিত স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হইয়া যান এবং অনন্ত কাল ধরিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করেন।

২৫। "ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ, প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।" —কেন উপনিষৎ ২।১৫

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি ॥"—ছান্দোগ্য ৭।২৩।১।

"এবাত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি তস্য সর্বেষ্ লোকেষ্ কামচারো ভবতি।—ছান্দোগ্য ৭।২৫।২

যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সুখ; যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহাতে সুখ নাই। ভূমাই সুখস্বরূপ; অতএব এই ভূমাসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

"আত্মাই অধোভাগে, আত্মাই ঊর্দ্ধভাগে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এই সমুদয় জগৎ —যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, এই প্রকার মনন করেন, এই প্রকার বিজ্ঞান (অনুভূতি) লাভ করেন তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্ম-মিথুন এবং আত্মানন্দ হন, তিনিই স্বরাট্ হন অর্থাৎ স্বারাজ্য লাভ করেন এবং সমস্ত লোকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

॥ আত্মা ও অমরত্ব ॥

যজুর্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক-উপনিষদে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যদর্শী ঋষি বাস করিতেন। মৈত্রেয়ী নামে তাঁহার এক সাধ্বী পতিগতপ্রাণা পত্নী ছিলেন। গৃহস্থাশ্রমের যে সমস্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম, কেবল তাহা সম্পন্ন করিয়াই যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, পরন্তু দেশের ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যও তিনি যথেষ্ট সৎকর্ম সাধন করিয়া মহাশান্তিতে কালাতিপাত করিতেন। এইরূপে নিঃস্বার্থ সৎকর্মাদির দ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সত্যস্বরূপ আত্মার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তপস্যার ফলে নির্মল বুদ্ধি দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই পরিদৃশ্যমান্ বাহ্যজগৎ ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, গার্হস্থ্য জীবন মনুষ্যের ক্রমোন্নতির পক্ষে একটি সোপান বা স্তর মাত্র; সেজন্য তিনি মনস্থ করিলেন যে, গৃহস্থাশ্রম হইতে অধিকতর উন্নত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া তিনি জীবনযাপন করিবেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সংসারী লোকেরা মোহে অভিভূত হইয়া পার্থিব বাসনা চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই কারণে তিনি নির্জনে বাস করিয়া নিত্য বস্তুর ধ্যানে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একমাত্র সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সংসারের বিষয়-কোলাহলের বহুদূরে অরণ্যে বাস করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে তিনি ইচ্ছা করিলেন; পরমাত্মার ধ্যানে সর্বদা নিমগ্ন থাকিয়া এবং

চিত্তনিরোধরূপ সমাধি লাভ করাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল।

একদিন এই ঋষি তাঁহার পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন : মৈত্রেয়ী, প্রিয়তমে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া আমি বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করি। তুমি এই সমস্ত ভোগ কর এবং সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর।"[১] স্বামীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মপরায়ণা মৈত্রেয়ী সন্তপ্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন : "ভগবন্, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যদি আমি সসাগরা পৃথিবী এবং সর্বপ্রকার পার্থিব ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হই তাহা হইলে আমি কি তাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারিব?"[২]

বর্তমান কালে দেখি যে, অধিকাংশ রমণী ঐহিক ভোগ ও ধন-সম্পত্তির অধিকারিণী হইবার জন্য আগ্রহী আবার যদি কোনও সূত্রে সামান্য সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারিণী হইবার কাহারও আশা থাকে, তাহা হইলে তাহাতেই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। মৈত্রেয়ী কিন্তু এই প্রকার নারী ছিলেন না; তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, অমরত্বের ন্যায় অপূর্ব সম্পদ আর কিছুই নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "আপনি যে সমস্ত ধন-সম্পত্তি আমাকে দান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইলে কি আমি অমরত্ব লাভ করিতে

১। "মৈত্রেয়ী হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণীতি।"

—উঃ, বৃহদারণ্যক ৪।৫।২

২। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী, যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ, স্যাং ন্বহং তেনামৃতাহো।"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৩

পারিব ?" এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন : "না, এইরূপ ঐশ্বর্যের দ্বারা অমরত্ব লাভের কোনও আশা নাই ; কেহ কখনও পার্থিব সম্পত্তির দ্বারা অমর হইতে পাবে না। তবে যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত ধন-সম্পত্তি প্রাপ্ত হও তাহা হইলে তুমি ধনবান্ লোকের মতন যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তাহা লাভ করিয়া পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিবে।"[৩] এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন : "স্বামিন্, যে বস্তুদ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব না, সে বস্তু লইয়া আমি কি করিব ? যদি আপনার নিকট এমন কোন বস্তু থাকে যাহার দ্বারা আমি অমরত্ব লাভ করিতে পারি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই বস্তু দান করুন, আমি আপনার অন্য ঐশ্বর্যের জন্য লালায়িতা নহি।"[৪]

মৈত্রেয়ীর কথা শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন : "মৈত্রেয়ী বাস্তবিকই তুমি আমার প্রিয়তমা। তুমি তোমারই উপযুক্ত কথা বলিয়াছ। যাহার দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় তাহাই আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগপূর্ণক শ্রবণ কর।"[৫] তাহার পরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পরম প্রেমাস্পদ বস্তুর যথার্থ স্বরূপ কি তাহা প্রথমে ব্যাখ্যা করিলেন। লোকে তাহাদের পিতামাতাকে,

৩। "নেতি, নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যো যথৈবোপকরণবতাং জীবিতং, তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশাঽস্তি বিত্তেনেতি ॥" —বৃহদারণ্যক ৪।৫।৩

৪। "সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৪

৫। "স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, প্রিয়া বৈ খলু নো ভবতী সতী প্রিয়ং অদৃধৎ, হন্ত তর্হি ভবত্যেতদ্ব্যাখ্যাস্যামি তে, ব্যাচক্ষাণস্য তু মে নিদিধ্যাসস্বেতি ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৫

সন্তানাদিকে, স্বামীকে, স্ত্রীকে এবং ধনসম্পত্তি ও অন্যান্য যাহা কিছু আপনার বলিতে আছে সে সকলকেই মাত্র ভালবাসে ; কিন্তু তাহারা কাহাকে বস্তুতঃ ভালবাসে তাহা কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারে না। তাহাদের প্রকৃত ভালবাসার পাত্র কখনও কোন পাঞ্চভৌতিক পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু পাঞ্চভৌতিক শরীরের পশ্চাতে যে আত্মা অবস্থান করিতেছেন তাহাই প্রকৃত ভালবাসার পাত্র হইয়া থাকে। এই কারণে মহর্ষি মৈত্রেয়ীকে বলিলেন ঃ "প্রিয়ে, তোমাকে সত্যই বলিতেছি যে, পত্নী তাহার স্বামীর পাঞ্চভৌতিক দেহকে স্বামী বলিয়া ভালবাসে না, তাহার স্বামীর মধ্যে যে আত্মা অবস্থান করিতেছেন তিনিই যথার্থ স্বামীরূপে স্ত্রীর নিকট প্রিয় হইয়া থাকেন।"[৬]

স্বামীর পাঞ্চভৌতিক শরীর যে সমস্ত জড়-পরমাণুপুঞ্জ দ্বারা গঠিত সেই সমস্ত উপাদানকে পত্নী ভালবাসে না, সে তাহার স্বামীর আকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত সেই আত্মাকেই ভালবাসিয়া থাকে। আবার "স্বামী তাহার পত্নীর স্থূল শরীরকে পত্নী বলিয়া ভালবাসে না, কিন্তু ঐ পত্নীর দেহের মধ্যে যে আত্মা আছেন তাহাই স্বামীর প্রেমাস্পদ।"[৭] প্রকৃতপক্ষে পত্নীর স্থূলদেহ স্বামীর প্রিয় নহে, কিন্তু তাহার আত্মাই স্বামীর নিকট প্রিয় বস্তু। যখন পত্নীর দেহ হইতে আত্মা চলিয়া যায় তখন সেই মৃতদেহটির প্রতি স্বামীর ভালবাসা থাকে না, এমন কি স্বামী তখন উহা আর স্পর্শই করিবে না। "লোকে

৬। "স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

৭। "ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

তাহাদের সন্তানগণের জড় দেহকে সন্তান বলিয়া ভালবাসে না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করিতেছেন।"[৮]

যখন মাতা তাঁহার সন্তানকে ভালবাসেন তখন আপনারা কি মনে করেন যে, যে পাঞ্চভৌতিক জড়-উপাদানের দ্বারা সন্তানের মুখমণ্ডল গঠিত সেই অচেতন জড় পদার্থকেই ভালবাসিতেছেন?—না, তাহা নহে; জড় পরমাণুপুঞ্জের অন্তরালে অবস্থিত আত্মাই সন্তানের আকৃতি সৃষ্টি করিয়া মাতার আত্মাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভৌতিক জড় পদার্থের মধ্যে ভালবাসার অস্তিত্ব দেখা যায় না। আধ্যাত্ম রাজ্যে তুইটি আত্মার পরস্পরের আকর্ষণের নামই প্রেম অথবা ভালবাসা। যখন লোকে তাহাদের বন্ধু বা আত্মীয়বর্গকে ভালবাসে তখন সেই আকর্ষণই উহাদের ভালবাসার বাহ্যিক প্রকাশের মূলে আছে ইহাই বুঝিতে হইবে। "প্রিয়ে, বাস্তবিকই ধনসম্পদ ভালবাসার পাত্র নহে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, আত্মার প্রতি ভালবাসা আছে বলিয়াই সম্পদ বা ঐশ্বর্য প্রিয়বস্তু বলিয়া বোধ হয়।"[৯]

ভালবাসার আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে আত্মা। যখন আমরা ঐশ্বর্য বা বিষয়-সম্পত্তিকে প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করি তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অর্থ অথবা সম্পত্তির উপর যে আকর্ষণ বা ভালবাসা দেখা যায় তাহা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আত্মার অথবা স্বীয় আত্মার প্রতি ভালবাসা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। আমরা যে পশু, পক্ষী, অশ্ব, কুকুর

৮। "ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬।

৯। "ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

প্রভৃতিকে ভালবাসিয়া থাকি তাহা উহাদের স্থূল দেহের জন্য নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে আত্মা বিরাজ করেন বলিয়াই উহা-দিগকে আমরা এইরূপ ভালবাসিয়া থাকি। যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এইরূপ বুঝাইয়াছেন যে, যেখানেই প্রকৃত ভালবাসা আছে সেখানেই আত্মার প্রকাশ বিদ্যমান। তিনি বলিলেন ঃ "প্রিয়ে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মনুষ্যগণের মধ্যে আত্মা আছেন বলিয়াই লোকে তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে।"

কাহারও মৃত শরীর আমাদের অন্তঃকরণে ভালবাসা উদ্দীপিত করে না। "লোকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে, স্বর্গাদি লোককে, দেবতাদিগকে, চারি বেদকে, এবং অন্যান্য চেতন ও অচেতন বস্তুগুলিকে তাহাদের বৈশিষ্ট্যের জন্য ভালবাসে না, পরন্তু উহাদের মধ্যে আত্মার প্রকাশ আছে বলিয়াই লোকে উহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে।"[১০]

যখন কেহ নিজের তৃপ্তির জন্য অপরকে ভালবাসে তখন বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভালবাসা অত্যন্ত স্বার্থ-জড়িত, কিন্তু যখন ঐ ভালবাসার নির্ঝর ধারা অপরের অন্তরস্থ আত্মার দিকে প্রবাহিত হয় তখন স্বার্থপরতার ভাবটি আর থাকে না। উহা ক্রমে ক্রমে পবিত্র ঐশ্বরিক প্রেমে পরিণত হয়। জগতের প্রত্যেক বস্তুতে অপরিবর্তনীয় চৈতন্যময়

১০। "ন বা অরে ব্রাহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্ত্যাত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।৬

আত্মসত্তাই অপরের আত্মাকে আকর্ষণ করে। আমরা সেই আত্মার স্বরূপ অবগত নহি যাহার অভিমুখে আমাদের স্বার্থপর অথবা ভালবাসার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহা হইতে উক্ত স্রোত নিঃসৃত হইয়া মনুষ্য, পশু, দেবতা অথবা পার্থিব ধন, সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের প্রতি ধাবিত হইতেছে। একজন কৃপণ মোহবশতঃ তাহার বিষয়-ঐশ্বর্যকে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালরূপে জানে যে, সেই ঐশ্বর্য কেবল বিনিময়ের একটি উপায়মাত্র এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা কিছু দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মাত্রই লাভ করিতে পারা যায়। সে নিজের দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া দেহটিতেই অত্যন্ত আসক্ত হয় এবং সেই দেহটিকে পরিপাটী রাখিবার উপায়-রূপে ঐ অর্থকেই ভাল-বাসিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের স্থূল দেহটিই হইতেছে আকর্ষণের কেন্দ্রস্বরূপ, অর্থাৎ যাহা কিছু সে করে তাহা ঐ দেহের তৃপ্তির জন্যই করে এবং সেই কারণবশতঃ যাহা কিছু তাহাকে সুখী করে তাহা তাহার অতীব প্রিয়বস্তু। "মৈত্রেয়ী, সেইজন্য আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই আত্মার বিষয় শ্রবণ করিতে হইবে, চিন্তা করিতে হইবে। এবং ধ্যান করিতে হইবে। প্রিয়ে, যখনই এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তখনই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।"[১১] যাহা হইতে অবিরাম প্রেমধারা নিঃসৃত হইতেছে এবং যাহার অভিমুখে তাহা প্রবাহিত হইতেছে সর্ব-প্রকার আকর্ষণের সেই কেন্দ্রস্বরূপ আত্মার প্রকৃত ধর্মসমূহকে জানিতে হইবে আত্মার বিষয় সর্বদা শ্রবণ করিতে হইবে এবং তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। যখন এই আত্মাতে মন নিবিষ্ট

১১। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্॥" —বৃহদারণ্যক ২।৪।৫

তখনই ইহার স্বরূপ প্রকাশিত হইবে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই আত্ম-জ্ঞান ও অমরত্ব লাভ হইবে।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন: "যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে তাহার স্থূলদেহ অথবা তাহাব ধন-সম্পত্তিব জন্য ভালবাসে তাহা হইলে সে ঐ প্রেমাস্পদব্যক্তি-কর্তৃক নিশ্চয়ই কোন-না-কোন সময়ে পরিত্যক্ত হইবে। যদি আমরা কাহাবও আত্মাব অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখিয়া অচেতন পরমাণু-রাশিব সমষ্টিরূপ তাহাব জড় দেহকেই ভালবাসি, অর্থাৎ তাহাব "আত্মা বলিয়া কোন বস্তু নাই এই ধারণা করিয়া জড় দেহটিই সেই ব্যক্তি এই বিবেচনা কবি এবং তাহার পাঞ্চ-ভৌতিক দেহটিব প্রতি ভালবাসা দেখাই তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি সন্তুষ্ট হইতে পারে?—কখনই না। বরং সেই বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদিগের সংসর্গ ত্যাগ করিবে। যদি আমরা কখনও ব্রহ্মবিদ্‌কে আত্মরহিত জড় পদার্থ-রূপে ধারণা করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি এবং যদি তিনি আমাদেব মনের ভাব বুঝিতে পারেন তাহা হইলে অবিলম্বে তিনি আমাদেব সঙ্গ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন।"[১২]

যদি আমরা রাজাব নিকটে উপস্থিত হইয়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশ কবি যে, তিনি আত্মহীন জড় পদার্থের পিণ্ড তাহা

১২। "ব্রহ্ম তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ। লোকাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ। দেবাস্তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো লোকান্ বেদ বেদাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ। ভূতানি তং পরাদুর্যোঽন্যত্রাত্মনো ভূতানি বেদ। সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ। ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রমিমে দেবা ইমানিভূতানীদং সর্বং যদয়মাত্মা॥"

—বৃহদারণ্যক ২।৪।৬

হইলে রাজা আমাদিগকে কখনই ভালবাসিবেন না, বরং তিনি আমাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। "এই কারণবশতঃ যিনি মনে করেন স্বর্গাদি যাবতীয় লোকের মধ্যে আত্মা নাই, দেবতাগণের মধ্যে আত্মা নাই, বেদসমূহের মধ্যে আত্মা নাই, বা চেতন জীব ও অচেতন পদার্থ সকলের মধ্যে আত্মা নাই, তিনি উপরি-উক্ত প্রত্যেকটির দ্বারা পরিত্যক্ত হইবেন।" যদি আমরা পরলোকগত আত্মীয়স্বজনের ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে 'আত্মা নাই' এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করি, অথবা আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করি তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি আমরা ঈশ্বরকে অচেতন জড় পদার্থ বলিয়া ধারণা করি এবং তাঁহার ষড়ৈশ্বর্য-পূর্ণ অবিনশ্বর ও সর্বব্যাপী সত্তাকে ভালবাসিতে না পারি তাহা হইলে তিনি কখনই আমাদিগের মধ্যে প্রকাশিত হন না; বরং আমাদিগের অগোচর হইয়া থাকিবেন। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে, সর্ব অস্তিত্বের-স্বরূপ আত্মাকে বাদ দিলে কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আত্মার সহিত সম্বন্ধকে বাদ দিয়া আমরা যে-কোন বস্তু আমাদিগের ধারণার মধ্যে আসিবে না, অর্থাৎ তাহারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, কারণ বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ সর্বব্যাপী আত্মার সহিত কোন-না-কোন প্রকার সম্বন্ধেযুক্ত থাকিয়া অবস্থান করিতেছে। আত্মা সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত এবং সর্বভূত আত্মাতে বিদ্যমান। যাহা-কিছু আমরা দর্শন করি অথবা যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য; যাহা-কিছু আমরা জানি এবং চিন্তা করি সে সমস্তই আত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংযুক্ত; বস্তুতঃ সকল পদার্থই আত্মার সহিত অভিন্নভাবে বর্তমান। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয়পদার্থ স্বরূপতঃ সেই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে

পারে যে, প্রত্যেক বস্তুই আত্মা হইতে অভিন্ন ইহা আমাদিগের উপলব্ধি হওয়া কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন: "ঢাকের কাঠির দ্বারা আঘাত করিলে ঢাক হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দ যে অন্যান্য শব্দ হইতে পৃথক্ এই তথ্য বুঝিতে হইলে যেমন ঐ শব্দের ভিত্তিস্বরূপ ঢাক ও ঢাকের কাঠির উল্লেখ করিলে বুঝা যায়, অন্য কোন উপায়ে উহার পার্থক্য বুঝা যায় না, সেইরূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ববোধের মূলে যে জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং যাহা ভিন্ন কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না সেই আত্মার অস্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া উহার বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হইয়া থাকে, নতুবা ঐ বস্তুর পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ হয় না।

"শঙ্খ, বীণা অথবা কোনপ্রকার বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইলে যে ধ্বনি শ্রবণ করা যায়, সেই ধ্বনিগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইলে যাহা হইতে ঐ ধ্বনি উদ্ভূত হইতেছে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; আবার এই যে বিভিন্নপ্রকার ধ্বনি, উহা বস্তুতঃ একই মূল শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশমাত্র। সেইরূপ এই বিশ্বরাজ্যের মূলে যে একমাত্র শাশ্বত সত্য সর্বব্যাপী আত্মা বিদ্যমান আছেন তিনিই নাম-রূপের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আমাদিগের নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন।[১৪]

———

১৩। "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ॥"—বৃহদারণ্যক ২।৪।৭

১৪। "স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যাঞ্ছব্দাঞ্ছক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ॥"

—বৃহদারণ্যক, ২।৪।৮

যেমন জল সিক্ত কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলে আপাতঃপ্রতী-মান ধূম ও অগ্নিবিহীন ঐ কাষ্ঠরাশি হইতে প্রথমে ধূমরাশি ও পরে অগ্নিশিখা নির্গত হয়, হে প্রিয়তমে! সেইরূপ সমস্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আকর সেই এক পরমাত্মা (ব্রহ্ম) হইতে স্বতঃই ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, দর্শনশাস্ত্রসমূহ এবং উপনিষৎ, বিজ্ঞান, সূত্র, ভাষ্য ইত্যাদি যাহা কিছু এই জগতে বা অন্যান্য সমস্ত লোকে জ্ঞাতব্য আছে সে সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছে।"[১৫]

সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি অমুক অমুক ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা এই এই জ্ঞান বা বিজ্ঞান লাভ করিয়াছি; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাহা পদার্থবিৎ, দার্শনিক, যোগী, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় সে সমস্তই অনন্ত জ্ঞানের আধারস্বরূপ এক পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বা নিঃসৃত হইয়াছে। যেমন এক প্রজ্বলিত বহ্নি হইতেই ধূম, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখাসমূহ নির্গত হয় সেইরূপ এক অনন্ত ব্রহ্ম হইতে বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রসমূহে বর্ণিত আধ্যাত্মিক সত্য এবং কলাশাস্ত্র ও ইতিহাসের অন্তর্গত তথ্যসমূহ উদ্ভূত হইয়াছে। আমাদের যে স্বাভাবিক জ্ঞান আছে এবং যাহা আমরা আমাদের দৈনিক জীবনে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা সেই নিত্য এক অবিনাশী অপরিবর্তনশীল ও জ্ঞানসমষ্টির স্বরূপ আত্মারই বিকাশমাত্র এবং এই জ্ঞান-ঘনকে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৫। "স যথার্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগধূমা বিনিশ্চরন্ত্যেবং বা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি * * অস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥"
—বৃহদারণ্যক ২।৪।১০

সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু এবং প্রকৃতির শক্তিসমূহ অব্যক্তরূপে এক অখণ্ডসত্তা-ব্রহ্মে লীন ছিল এবং ক্রমবিকাশের নিয়মানুযায়ী সেই সুপ্তা প্রকৃতি স্বতঃই নানারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেঃ "তর্হ্যেদমব্যাকৃতমাসীৎ"।[১৬] যেমন ব্যক্তিমাত্রই ফুস্‌ফুসের মধ্যে যে বায়ুরাশি নিঃশ্বাসরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে তাহাকে অনায়াসে প্রশ্বাসরূপে বহির্গত করিয়া দেন সেইরূপ এই নিখিল বিশ্বজগতের অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে সমস্ত স্থূল বাহ্য ও সূক্ষ্মভূত, শক্তিসমূহ এবং সকল প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্রহ্মের প্রসুপ্তা প্রকৃতির মধ্যে অব্যক্ত কারণরূপে অবস্থিত ছিল তাহা বিশ্বসৃষ্টির বা অভিব্যক্তির সময় স্বতঃই বহির্গত হয়। আবার যেমন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সর্বপ্রকার নদীর জল এক সমুদ্রেই প্রবাহিত হয় তেমন প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু এবং জ্ঞানরাশি সেই অনন্ত ব্রহ্মের প্রকৃতিতে লীন হয় ও তাহাতেই সুপ্তরূপে অবস্থান করে ; এই ব্রহ্মরূপ অনন্ত সমুদ্রই জ্ঞানরাশি ও বাহ্য বস্তুনিচয়ের আধার এবং অন্তে এই সমস্তই আবার ঐ সমুদ্রেই মিশিয়া যায়।[১৭] "যেরূপ জিহ্বা দ্বারাই সর্বপ্রকার স্বাদ গ্রহণ করা যায়, সর্বপ্রকার স্পর্শ কেবল ত্বক্‌দ্বারা অনুভব করা যায়, সর্বপ্রকার গন্ধমাত্র নাসিকা দ্বারাই অনুভূত হয়, বিভিন্ন প্রকার বর্ণ কেবল চক্ষু দ্বারাই দৃষ্ট হয়, সর্বপ্রকার শব্দ মাত্র কর্ণদ্বারা শ্রুত হয় ; যেমন মনই একমাত্র মানসিক ভাব

১৬। "স যথা সর্বাসামপাং সমুদ্র একায়নমেবং সর্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়নমেবং সর্বেষাং গন্ধানাং নাসিকে একায়নমেবং সর্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেবং সর্বেষাং রূপাণাং চক্ষুরেকায়নমেবং সর্বেষাং।

—বৃহদারণ্যক ২।৪।১১

১৭। 'অব্যাকৃত' অব্যক্ত প্রকৃতি। সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মসত্তা ছিল, বিশ্ববৈচিত্র্য ছিল না।

রাশির আকর এবং সর্বপ্রকার বিবেক বা বিচার জ্ঞানের একমাত্র আকর বুদ্ধি; যেমন সকল বিদ্যার আকর হৃদয়, সকল কর্ম হস্তদ্বারা করা হয়, সকল সুখের আধার উপস্থ; যেমন পায়ু কেবল বিসর্গের মূলে থাকে, পদদ্বয় গমনাগমনের একমাত্র যন্ত্র, বাগযন্ত্র যেমন বেদোচ্চারণের মূলে আছে সেইরূপ সর্বপ্রকার অনুভূতি ও জ্ঞান সেই এক চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা হইতেই উদ্ভাসিত হয়।"[১৮]

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বুঝাইতেছেন যে, ব্রহ্মই সকল বস্তুর আদি ও অন্ত; অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতেই হইতেছে এবং প্রলয়কালে সমস্তই আবার সেই পরমাত্মাতেই লীন হইতেছে। এই ব্রহ্ম যেন এক অদ্বিতীয় চৈতন্যঘনের মূর্ত রূপ, ইহাতে অপর কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। ইহাকে বহু বস্তুর সমষ্টি বলা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে: "যেমন এক তাল লবণের ভিতরের মধ্যভাগের ও বহির্ভাগের মধ্যে কোনও তারতম্য নাই, কিন্তু উহার সর্বত্রই লবণের স্বাদ বর্তমান থাকে তেমন ব্রহ্মেরও মধ্যপ্রদেশ বা বহিঃপ্রদেশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; উহা জ্ঞানের ঘনীভূত পদার্থের স্বরূপ। তাহার আদিও নাই, অন্তও নাই; এবং তাহা অসীম।"[১৯]

১৮। "শব্দানাং শ্রোত্রমেকায়নমেবং সর্বেষাং সঙ্কল্পানাং মন একায়নমেবং সর্বাসাং বিদ্যানাং হৃদয়মেকায়নমেবং সর্বেষাং কর্ম্মণাং হস্তাবেকায়নমেবং সর্বেষাং আনন্দানামুপস্থ একায়নমেবং সর্বেষাং বিসর্গানাং পায়ুরেকায়নমেবং সর্বেষামাধ্বনাং পাদাবেকায়নমেবং সর্বেষাং বেদানাং বাগেকায়নম্॥'—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১২

১৯। "স যথা সৈন্ধবঘনোহনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেহয়মাত্মাহনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেবানুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞাহস্তীত্যরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩

অসীম ও অনন্ত বস্তুর দুইটি বিকাশ আছেঃ একটি সমষ্টি যাহাকে 'ব্রহ্ম' বলে, এবঃ অপরটির ব্যষ্টি যাহাকে 'জীবাত্মা' বলে। 'অহং'-জ্ঞানের উৎসরূপে, অর্থাৎ 'আমি আছি' এই জ্ঞানের মূলস্বরূপ ইনি ব্যষ্টিভাবে আমাদের দেহেন্দ্রিয়াদির সংযোগে বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হন। আবার যখন এই আত্মা মৃত্যুর সময় স্থূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হন তখন ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়গুলিকে গ্রহণ কবিতে বিরত হয় এবং মাত্রাগুলি যে স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল সেই কারণ অবস্থায় প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুর পরে কেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদিকে আর গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেনঃ "প্রিয়ে, যদিও আমি তোমাব নিকট বলিয়াছি যে, আত্মা অখণ্ডস্বরূপ তথাপি ইহা মনে রাখিও যে, যখন আত্মা এই দেহ হইতে চলিয়া যান তখন তাহার মর্ত্যলোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না। তখন আত্মার ইন্দ্রিয়বাজ্যের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়'।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেনঃ "প্রভু, আপনি যে বলিলেন 'মৃত্যুব পরে ঐ অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মার মর্ত্যলোকের ন্যায় জ্ঞান থাকে না' এই কথা শ্রবণ কবিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি। ইহা কিরূপে হইতে পারে?"[২০] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেনঃ "প্রিয়ে, আমি তোমাকে হতবুদ্ধি হইবার কথা তো কিছুই বলি নাই; অবিনাশিত্বই আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম।"[২১] তোমাব সমস্যা সমাধান করিবার জন্য আমি উহা পুনরায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতেছি। আত্মা স্বতঃই মৃত্যুবহিত ও

২০। "সা হোবাচ মৈত্রেয্যত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তমাপীপিপন্ন বা অহমিমং বিজানামীতি॥"—বৃহদাবণ্যক ৪।৫।১৪

২১। "স হোবাচ ন বা অরেহহং মোহং ব্রবীম্যবিনাশী বা অবেহযমাত্মাহনুচ্ছিত্তিধর্মা॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৪

অমর। "যতক্ষণ বিষয়ী জ্ঞাতা ও বিষয় জ্ঞেয় এই দ্বৈতভাব বর্তমান থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ অনুভবযোগ্য জ্ঞেয় বিষয় ও অনুভবকর্তা জ্ঞাতা পৃথক্ ভাবে থাকেন ততক্ষণ সেই জ্ঞাতা দর্শন করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি অনুভব করেন, ঘ্রাণ, আস্বাদ, স্পর্শ ও চিন্তা ইত্যাদি করিয়া থাকেন এবং সেই সকল বিষয়কে জানিতে পারেন।"[২২]

দেহ ও আমি-জ্ঞানযুক্ত আত্মা যতক্ষণ উক্ত প্রকার দ্বৈত ভূমিতে বা আপেক্ষিক রাজ্যে থাকেন ততক্ষণই তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের অনুভূতি হয়। যখন দ্রষ্টার দৃশ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে তখনই তাহার দর্শনের অনুভূতি সম্ভব হইতে পারে। যে গন্ধ-দ্রব্যের সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই তাহার আঘ্রাণ আমরা কিরূপে পাইতে পারি? আস্বাদনীয় বা শ্রোতব্য বিষয়ের সহিত জ্ঞাতার (আত্মার) কোনও সম্বন্ধ না থাকিলে ঐ বিষয়ের অনুভূতিই হইবে না। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুভবযোগ্য বিষয়ের সহিত অনুভব-কর্তার আপেক্ষিক সম্বন্ধ না থাকিলে কোনও প্রকার অনুভূতির উদয় হওয়া সম্ভবপর হয় না। আবার যখন আমরা গভীর নিদ্রায় সুষুপ্তিতে অভিভূত থাকি তখন আমরা দর্শন করি না, শ্রবণ করি না, আস্বাদন করি না, আঘ্রাণও করি না, বা কিছু বুঝিতেও সক্ষম হই না। জ্ঞেয় বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়রাজ্যেই অবস্থান করে, সুতরাং যখন আমরা অতীন্দ্রিয় ভূমিতে অবস্থান করি অর্থাৎ যে ভূমিতে দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ইত্যাদি ব্যাপার নাই সেই স্থানে কিরূপে দর্শনাদি ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া সম্ভবপর হইতে পারে?

২২। "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজনাতি ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

স্বপ্নশূন্য নিদ্রায়, অর্থাৎ সুষপ্তি অবস্থায় প্রত্যেকের একই প্রকার উপলব্ধি হয়; এই অবস্থায় স্ত্রীজাতি বা পুরুষজাতির মধ্যে উপলব্ধির কোনও ভেদ দেখা যায় না। "ঐ অবস্থায় পিতা অপিতা হন, অর্থাৎ পিতার পিতৃত্ব থাকে না এবং মাতার মাতৃত্ব থাকে না।"[২৩] আবার সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ "যেখানে দ্বৈতভাব বা বহুত্ব ভাবের সম্পূর্ণ অভাব এবং যেখানে কেবল এক অনন্ত জ্ঞানসমুদ্র বিদ্যমান সেখানে দর্শনই বা কি হইবে, আঘ্রাণ করিবার বিষয় বা কি থাকিবে এবং আস্বাদনই বা কিসের হইবে?"[২৪] যেখানে আপেক্ষিকতার অস্তিত্ব নাই বা যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় কিছুই নাই সেখানে দর্শন-স্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যাহার সাহায্য ব্যতীত কিছুই জানা যায় না তাহাকে কিরূপে জানিতে পারা সম্ভব?

যে আত্মা সকল বস্তু বা বিষয়ের একমাত্র জ্ঞাতা, অর্থাৎ যিনি সকল বস্তু বা বিষয়ের সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন সেই আত্মাকে আবার কোন্ জ্ঞান্‌শক্তি অবগত করাইতে পারে? না, তাহা জানিবার জন্য আর কোন দ্বিতীয় জ্ঞান নাই, কারণ আত্মাই এই নিখিল বিশ্বজগতের একমাত্র জ্ঞাতা।

এখন দেখিতে হইবে যে, আত্মাকে বিদিত হইবার প্রশস্ত উপায় কি? যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা আমরা জ্ঞানের

২৩। "অত্র পিতাঽপিতা ভবতি, মাতাঽমাতা" ইত্যাদি শ্রুতিতে আছে।—বৃহদারণ্যক ৪।৩।২২

২৪। "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্, যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ।" —বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

বিষয়ীভূত বস্তু হইতে প্রকৃত জ্ঞাতা পুরুষকে পৃথক্ভাবে বুঝিতে পারি ; প্রত্যেক বস্তুকেই বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং মনে মনে 'নেতি নেতি'[২৫] অর্থাৎ "ইহা আত্মা নহে, বা আত্মা ইহাও নহে" এইরূপ স্থির করিয়া যাহা আত্মা নহে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে সর্বপ্রকার জ্ঞেয় পদার্থগুলি, সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সর্বপ্রকার চিন্তা এবং মনের ভাব ও বুদ্ধির যাবতীয় ক্রিয়া শুদ্ধ-বিচারের দ্বারা চিত্ত হইতে একে একে অপসারিত হইলে সমাধি অবস্থায় আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়।

বুদ্ধি যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন তাহার দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, 'আত্মা' বুদ্ধির অগোচর। আত্মাকে কেহ নাশ করিতে পারে না, ইহা অমর : কেহ কোন উপায়ে আত্মার পরিবর্তন সাধিত করিতে পারে না, ইহা অপরিবর্তনশীল ; আত্মাকে কিছুর দ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায় না, ইহা অস্পর্শ ; আত্মার কোনও প্রকার বন্ধন নাই, ইহা নিত্য মুক্ত। আত্মার সুখ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, ইহা সুখদুঃখের অতীত। আত্মা সর্বদাই সমভাবে একরূপ বর্তমান আছেন। "প্রিয়ে, যে আত্মার ধর্ম এই প্রকার সেই আত্মাকে কি উপায়ে এবং কাহার দ্বারাই বা জ্ঞাত হইতে পারা যায় ? মৈত্রেয়ী, আত্মার স্বরূপ যাহা বলিলাম বাক্যের দ্বারা তাহা এই পর্যন্তই বর্ণনা করা যায় ; অতীত যাহা কিছু আছে এবং যে জ্ঞানের দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এক মাত্র সেই সমাধি অবস্থায় উপলব্ধি হইয়া

২৫। "স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্য্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি, বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার ॥"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৫

থাকে। প্রেমের, জ্ঞানের, আনন্দের এবং সত্যের আধার বা মূল সেই আত্মাকে বিদিত হইলেই অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে।” এই উপদেশ প্রদান করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে তিনি সেই নিত্যবস্তুর ধ্যানে কালযাপন করিতে লাগিলেন; অবশেষে সমাধি অবস্থায় তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। মানব জীবনের একমাত্র চরম উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ, যাহার দ্বারা আমরা এই বিশ্বকে সর্বতোভাবে বুঝিতে পারি; একমাত্র আত্মজ্ঞানের সাহায্যেই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে সমস্ত রহস্যই ভেদ করা যায়। যিনি আত্মদর্শন করিয়াছেন তিনি প্রলয়কালে জাগতিক বস্তুসমূহের কি হইবে তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে পারেন। অমরত্ব লাভ করিতে অভিলাষী হইলে এই 'আত্মাকে' জানিতে হইবে; ইহা ব্যতীত আর অন্য কোনও উপায় নাই।

আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বৈদিক ঋষি ঘোষণা করিয়াছেন ঃ সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত স্বয়ংপ্রকাশ সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মহান্ আত্মাকে আমি জানিয়াছি: একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়। ইহাছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নাই; অন্য কোন পন্থা নাই।”[২৬]

২৬। “বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥”

—শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ ৩।৮